



প্রিয় কবিতা

বাংলা ব্লগের প্রিয় কবিতা





হুমায়ূন আজাদ
মহাকালে মিশে যাওয়া দ্রোহী

উৎসর্গ



প্রথম ইন্টারনেট সংস্করণ
ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯
৩১ ভাদ্র ১৪১৬

সম্পাদক ও প্রকাশক



localtalk@gmail.com
somewhereinblog.net/blog/fusion5

Priyo Kabita, Edited & Published by
LocalTalk, First Internet Edition
Published on 15 September 2009

সূচিপত্র

অরণ্য মিত্র ●

রিক্সাওয়ালা

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ●

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আবুল হাসান ●

গোলাপের নিচে নিহত হে কবি কিশোর

আমার হবেনা, আমি বুঝে গেছি

শীতে ভালোবাসা পদ্ধতি

বদলে যাও, কিছুটা বদলাও

আগুনে পুড়বে ভস্ম এবং শৃঙ্খল

উচ্চারণগুলি শোকের

নিঃসঙ্গতা

আবিদ আজাদ ●

এখন যে কবিতাটি লিখবো আমি

যে শহরে আমি নেই আমি থাকবো না

আল মাহমুদ ●

বাতাসের ফেনা

ত্যাগে দুঃখে

আহসান হাবীব ●

দোতলার ল্যাভিং মুখোমুখি দুজন

আমি কোনো আগন্তুক নই

কাজী নজরুল ইসলাম ●

সাম্যবাদী

কাভারী হুশিয়ার!

বিদ্রোহী

সাহেব ও মোসাহেব

মানুষ

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

বর্ষা বিদায়

আমার কৈফিয়ৎ

জসীমউদদীন ●

কবর

জয় গোস্বামী =

বৃষ্টি ভেজা বাংলা ভাষা

যে-ছাত্রীটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে

হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে

জীবনানন্দ দাশ ●

সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে

তারাটিরই কথা হয়

অন্ধকার

হায় চিল!

অদ্ভুত আঁধার এক

সমারুঢ়

বনলতা সেন

শ্যামলী

পথ হাঁটা

আট বছর আগের একদিন

ঘোড়া

বুনো হাঁস

অবসরের গান

নাজিম হিকমত ●

জেলখানার চিঠি

তারাপদ রায় ●

দিন আনি, দিন খাই

এক জন্ম

নির্মলেন্দু গুণ ●

মানুষ

সেই রাত্রির কল্পকাহিনী

হলিয়া

স্বাধীনতা, উলঙ্গ কিশোর

উল্টোরথ

খেলাঘর

আসমানী প্রেম

তোমার চোখ এতো লাল কেন

ওটা কিছু নয়

তুলনামূলক হাত

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ●

অমলকান্তি

পাবলো নেরুদা =

কবিতা

পূর্ণেন্দু পত্নী ●

কথোপকথন-৪

কথোপকথন-১১

কথোপকথন-৩৯

যে টেলিফোন আসার কথা

স্মৃতি বড় উচ্ছৃঙ্খল

বুদ্ধদেব বসু ●

চিক্কায় সকাল

বিষ্ণু দে ●

বুড়ো-ভোলানো ছড়া

বিনয় মজুমদার ●

আমার আশ্চর্য ফুল

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ●

মুখোশ

মল্লিকা সেনগুপ্ত ●

আপনি বলুন, মার্কস

সূচিপত্র

মহাদেব সাহা ●

চিঠি দিও

শুদ্ধ করো আমার জীবন
সব দুঃখ ভুলে যাই প্রেমের গৌরবে

রফিক আজাদ ●

ভাত দে হারামজাদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ●

অসম্ভব

হারিয়ে-যাওয়া

শেষের কবিতা

নির্বাকের স্বপ্নভঙ্গ!

দেবতার গ্রাস

দুই বিঘা জমি

বলাকা

রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ ●

বাতাসে লাশের গন্ধ

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ●

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

মেঘ ডাকছে

একবার তুমি

আমিও একদিন

চাবি

অবনী বাড়ি আছে?

শহীদ কাদরী ●

বৃষ্টি, বৃষ্টি

তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা

সঙ্গতি

হস্তারকদের প্রতি

শূন্যতা

শামসুর রাহমান ●

আসাদের শার্ট

কবিকে দিও না দুঃখ

এই মাতোয়ালা রাইত

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত =

ছিন্নমুকুল

সুকান্ত ভট্টাচার্য =

ছাড়পত্র

চারাগাছ

রানার

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত =

উটপাখি

শাস্বতী

সুবোধ সরকার =

কী বললেন, বিশ্বায়ন?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ●

কেউ কথা রাখেনি

পাহাড় চূড়ায়

নারী

যদি নির্বাসন দাও

কোথায় গেল, কোথায়

সত্যবন্ধ অভিমান

যা চেয়েছি যা পাবো না

ইচ্ছে

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ●

লোকটা জানলই না

মে-দিনের কবিতা

ফুল ফুটুক না ফুটুক

সুরজিৎ ঘোষ ●

আজ ভালো থাকো

সিলভিয়া প্লাথ ●

অক্টোবরের পপি

দি অ্যাপলিকেন্ট

লেডি ল্যাজারাস

সকালের গান

সৈয়দ শামসুল হক ●

এখন মধ্যরাত

হেলাল হাফিজ ●

ফেরীঅলা

নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়

প্রস্থান

হুমায়ুন আজাদ ●

সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে

আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে

বাঙলা ভাষা

প্রেমিকার মৃত্যুতে

ব্যাপিকে রূপান্তরিত করছি মুক্তোয়

আমার কুঁড়েঘরে

গরিবদের সৌন্দর্য

স্পাইক মিলিগান ●

বাড়িতে স্বাগতম

একটি তুচ্ছ কবিতা

কুকুর প্রেমিকেরা

আয়না, আয়না

আমার বোন লরা

অন্যান্য ●

প্রচ্ছদ

উৎসর্গপত্র

লাইনআপ

সংকলন নিয়ে কয়েক ছত্র

কৃতজ্ঞতা

ব্লগের কয়েকটি প্রকাশনা



সংকলন নিষে

চলিত
কবিতা

নানাভাবে কবিতার সংকলন হয়— দশক, বিষয়, ভূখন্ড, দেশভিত্তিতে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা কবিতার সংগ্রহও রয়েছে। সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বা জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন নেই। নানাভাবেই বাংলা ভাষাভাষী পাঠক এই সংকলনগুলো থেকে তাদের প্রয়োজনীয় কবিতা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। কিন্তু প্রিয় কবিতা নিয়ে এই সংকলন সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিক। তা এই কারণে যে, বিশ্বজুড়ে বসবাসরত রুগাররা তাদের প্রিয় কবিতার তালিকা দিয়েছেন, অকুণ্ঠ মতামতও এবং তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বইটির শরীর। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে সামহোয়ারইন...রুগের রুগারদের কাছ থেকে প্রিয় কবিতার এই তালিকা আহ্বান করা হয়। বলাবাহুল্য, এতে সাড়া মেলে আশাতীত। বাংলাভাষায় এটিই সম্ভবত প্রথম কবিতা সংকলন, যা নির্মিত হয়েছে সরাসরি পাঠকের মতামতের ভিত্তিতে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ৪০ জন কবির মোট ১৩১টি এই কবিতা সংকলনে যুক্ত হয়েছে।

এই ই-সংকলনে ইউনিকোড বর্জন করা হয়েছে। পেশাদারি কাজের জন্য ইউনিকোড এখনো উপযুক্ত হয়ে উঠেনি। প্রধান প্রধান ডেস্কটপ পাবলিশিং সফটওয়্যারগুলোও ইউনিকোড সমর্থন করে না। ফলে

প্রচলিত বিজয় বাংলায় কাজ করা ছাড়া উপায় ছিল না। প্রচলিত বাংলাও আবার সমস্যামুক্ত নয়। ইউনিকোড থেকে রূপান্তরের সময় প্রচলিত বাংলায় এসে অনেক যুক্তাক্ষর অপার্ট অক্ষরে রূপ নিয়েছে। সংকলনে স্থান পাওয়া অনেকগুলো কবিতাই পাওয়া গেছে আবদুর রাজ্জাক শিপনের সৌজন্যে। তাকে ধন্যবাদ। রুগার রুবেল শাহ, অ্যামাটর, বিবর্তনবাদীসহ আরো অনেকের উৎসাহ আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে। এই ই-সংকলনটি অনুমতি ছাড়াই বিনামূল্যে বিতরণ করা যাবে। তবে কোনোক্রমেই এটি বিক্রির জন্য নয়। পাঠের সুবিধার জন্য ই-সংকলনের বিভিন্ন জায়গায় হাইপারলিংক যুক্ত করা হয়েছে। সূচিপত্রে নির্দিষ্ট শিরোনামে ক্লিক করে সরাসরি মূল কবিতার পাতায় যাওয়া যাবে। আবার যে কোনো পৃষ্ঠার নিচে-বাঁয়ে বৃত্তাকার চিহ্নে  ক্লিক করে সূচিপত্রে যাওয়া যাবে। অ্যাক্সোবেট রিডারসহ যে কোনো পিডিএফ রিডারে এই ই-সংকলনটি ভালোভাবে দেখা যাবে।

লোকালটক

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯, ঢাকা, বাংলাদেশ।

অরুণ মিত্র

রিক্সাওয়ালা

রিকশার চাকা দুটো ঘুরতে-ঘুরতে এইখানটায় এসে দাঁড়ায়। আমার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করে।

যে লোকটা চালায় একদিনও তার কামাই নেই, এই বিষম ঠান্ডাতেও না। এমনকি তাকে দেখে আমার চেনবার কথা নয়, কারণ তার মুখটা রোজই বদলায়। চাকা দুটোর ঘোরা থেকে চিনি।

সন্দের পর ছেলে-বউকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সে বেড়িয়ে পড়ে। কোন্ মহল্লা থেকে তা আমার কাছে পরিস্কার নয়। শুধু এইটুকু বুঝতে পারি, ভুতুড়ে আলোগুলো পার হয়ে গেলে একটা যে প্রকাণ্ড শীতের রাত পড়ে, তার ওপারে সে থাকে। যেখানেই থাকুক কিছু আসে যায় না।

আমার বাড়িটা যে তার চেনা, আমাদের দুজনের পক্ষে এটাই বড় কথা।

শীতের ঢেউ যে সব রাস্তায় আছড়ে পড়ে সেই সব রাস্তা দিয়ে রিকশা চড়ে আমি অনেকবার গিয়েছি। তখন মানুষটার মধ্যে আগুন গনগন করতে দেখেছি, যেন তার অস্থিমজ্জা জ্বলছে।

আমার গায়ে সেই আঁচ এসে লেগেছে। তার সুতির ফতুয়াটা তখন তীব্রভাবে উড়তে থাকে এবং

আমার ভয় হয় আমার গরম জামাকাপড় বুঝি দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে। কিন্তু না, প্রত্যেকবারই সে ভুতুড়ে আলোগুলোর ভেতর দিয়ে আমাকে আবার এখনো ঠিকমত পৌঁছে দিয়েছে। এমন কি, তার বাড়িটা যে একসময় খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল, এ অনুভূতিটাও আর লেশমাত্র থাকেনি। আজও সে আমাকে নিয়ে শীতের রাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং নিরাপদে আবার ফিরিয়ে আনবে।

খুব সম্ভব কোনো একদিন সে আর আসতে পারবে না। ভেতরের আগুনটা নিভে গিয়ে সে ঠান্ডায় জমে পাথর হয়ে কোথাও পড়ে থাকবে। কিন্তু তা বলে রিকশার চাকা দুটো তো মাটিতে গেড়ে যাবে না। তারা আবার ঘুরবে এবং তাই থেকে আমি বুঝব সেই রিক্সাওয়ালা হাজির হয়েছে, এখন যেমন বুঝি। এটাই আমার কাছে এক স্বস্তি।

জন্ম : নভেম্বর ১৯০৯

মৃত্যু : আগস্ট ২০০০

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ

গুগল বুকস

ক্যালকাটা ওয়েব



আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি



জন্ম : ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

মৃত্যু : ১৯ মার্চ ২০০১

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ

অডিও : কবিতা আবৃত্তি

ওপেন লাইব্রেরি

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তঁার করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তঁার পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল।

তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
অরণ্য এবং স্থাপদের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা,
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।

আমি উচ্চারিত সত্যের মতো
স্বপ্নের কথা বলছি।
উনুনের আগুনে আলোকিত
একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।
আমি আমার মা'য়ের কথা বলছি,
তিনি বলতেন প্রবহমান নদী
যে সাতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নদীতে ভাসতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মা'য়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি

গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।
ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে ভালোবেসে
মা'য়ের ছেলেরা চলে যায়,
আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃদপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না।

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি
তঁার পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।

আমরা কি তা'র মতো কবিতার কথা বলতে
পারবো,
আমরা কি তা'র মতো স্বাধীনতার কথা
বলতে পারবো!
তিনি মৃত্তিকার গভীরে
কর্ষণের কথা বলতেন
অবগাহিত ক্ষেত্রে
পরিচ্ছন্ন বীজ বপনের কথা বলতেন
সবৎসা গাভীর মত
দুগ্ধবতী শস্যের পরিচর্যার কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।

যে কর্ষণ করে তঁার প্রতিটি স্বেদবিন্দু কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।

যে কবিতা শুনতে জানে না

শস্যহীন প্রান্তর তাকে পরিহাস করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্ষুধার্ত থেকে যাবে।

যখন প্রবঞ্চক ভূস্বামীর প্রচণ্ড দাবদাহ
আমাদের শস্যকে বিপর্যস্ত করলো
তখন আমরা শ্রাবণের মেঘের মত
যুথবদ্ধ হলাম।
বর্ষণের স্নিগ্ধ প্রলেপে
মৃত মুক্তিকাকে সঞ্জীবিত করলাম।
বারিসিক্ত ভূমিতে
পরিচ্ছন্ন বীজ বপন করলাম।
সুগঠিত স্বেদবিন্দুর মত
শস্যের সৌকর্য অবলোকন করলাম,
এবং এক অবিশ্বাস্য আঘাণ
আনিঃশ্বাস গ্রহণ করলাম।
তখন বিষসর্প প্রভুগণ
অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করলো
এবং আমরা ঘন সন্নিবিষ্ট তাম্রলিপির মত
রৌদ্রালোকে উদ্ভাসিত হলাম।
তখন আমরা সমবেত কণ্ঠে
কবিতাকে ধারণ করলাম।
দিগন্ত বিদীর্ণ করা বজ্রের উদ্ভাসন কবিতা
রক্তজবার মত প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
পরভূতের গ্লানি তাকে ভুলুষ্ঠিত করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
অভ্যুত্থানের জলোচ্ছ্বাস তাকে নতজানু করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
পলিমাটির সৌরভ তাকে পরিত্যাগ করবে।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তিনি স্বপ্নের মত সত্য ভাষণের কথা বলতেন
সুপ্রাচীন সংগীতের আশ্চর্য ব্যাপ্তির কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
যখন কবিকে হত্যা করা হল

তখন আমরা নদী এবং সমুদ্রের মোহনার মত
সৌভ্রদ্রে সম্মিলিত হলাম।
প্রজ্জ্বলিত সূর্যের মত অগ্নিগর্ভ হলাম।
ক্ষিপ্ৰগতি বিদ্যুতের মত
ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করলাম।
এবং হিংস্র ঘাতক নতজানু হয়ে
কবিতার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলো।

তখন আমরা দুঃখকে ক্রোধ
এবং ক্রোধকে আনন্দিত করলাম।

নদী এবং সমুদ্রে মোহনার মত
সম্মিলিত কণ্ঠস্বর কবিতা
অবদমিত ক্রোধের আনন্দিত উৎসারণ কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে তরঙ্গের সৌহার্দ থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
নিঃসঙ্গ বিষাদ তাকে অভিশপ্ত করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মূক ও বধির থেকে যাবে।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল
আমি একগুচ্ছ রক্তজবার কথা বলছি।

আমি জলোচ্ছ্বাসের মত
অভ্যুত্থানের কথা বলছি
উৎক্ষিপ্ত নক্ষত্রের মত
কমলের চোখের কথা বলছি
প্রক্ষুটিত পুষ্পের মত
সহস্র ক্ষতের কথা বলছি
আমি নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের জননীর কথা বলছি
আমি বহুমান মৃত্যু
এবং স্বাধীনতার কথা বলছি।
যখন রাজশক্তি আমাদের আঘাত করলো
তখন আমরা প্রাচীন সংগীতের মত
ঝঞ্ঝু এবং সংহত হলাম।
পর্বত শৃংগের মত
মহাকাশকে স্পর্শ করলাম।

দিকচক্রবালের মত
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলাম;
এবং শ্বেত সস্ত্রাসকে
সমূলে উৎপাটিত করলাম।

তখন আমরা নক্ষত্রপুঞ্জের মত
উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত হলাম।

উৎক্ষিপ্ত নক্ষত্রের প্রস্ফুটিত ক্ষতচিহ্ন কবিতা
স্পর্ধিত মধ্যাহ্নের আলোকিত উন্মোচন কবিতা।
যে কবিতা গুনতে জানে না
সে নীলিমাকে স্পর্শ করতে পারে না।
যে কবিতা গুনতে জানে না
সে মধ্যাহ্নের প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত হতে পারে না।
যে কবিতা গুনতে জানে না
সে সস্ত্রাসের প্রতিহত করতে পারে না।

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি শ্রমজীবী মানুষের
উদ্বেল অভিযাত্রার কথা বলছি
আদিবাস অরণ্যের
অনার্য সংহতির কথা বলছি
শৃঙ্খলিত বৃক্ষের
উর্দ্ধমুখী অহংকারের কথা বলছি,
আমি অতীত এবং সমকালের কথা বলছি।
শৃঙ্খলিত বৃক্ষের উর্দ্ধমুখী অহংকার কবিতা
আদিবাস অরণ্যের অনার্য সংহতি কবিতা।

যে কবিতা গুনতে জানে না
যুথভ্রষ্ট বিশৃঙ্খলা তাকে বিপর্যস্ত করবে।
যে কবিতা গুনতে জানে না
বিভ্রান্ত অবক্ষয় তাকে দৃষ্টিহীন করবে।
যে কবিতা গুনতে জানে না
সে আজন্ম হীনমন্য থেকে যাবে।

যখন আমরা নগরীতে প্রবেশ করলাম
তখন চতুর্দিকে ক্ষুধা।
নিঃসঙ্গ মৃত্তিকা শস্যহীন

ফলবতী বৃক্ষরাজি নিষ্ফল
এবং ভাসমান ভূখন্ডের মত
ছিন্নমূল মানুষেরা ক্ষুধার্ত।

যখন আমরা নগরীতে প্রবেশ করলাম
তখন আদিগন্ত বিশৃংখলা।
নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের জননী শোকসন্তপ্ত
দীর্ঘদেহ পুত্রগণ বিভ্রান্ত
এবং রক্তবর্ণ কমলের মত
বিস্ফোরিত নেত্র দৃষ্টিহীন।
তখন আমরা পূর্বপুরুষকে
স্মরণ করলাম।
প্রপিতামহের বীর গাঁথা
স্মরণ করলাম।
আদিবাসী অরণ্য এবং নতজানু স্থাপদের কথা
স্মরণ করলাম।

তখন আমরা পর্বতের মত অবিচল
এবং ধ্রুবনক্ষত্রের মত স্থির লক্ষ্য হলাম।

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি স্থির লক্ষ্য মানুষের
সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা বলছি
শ্রেণীযুদ্ধের অলিন্দে
ইতিহাসের বিচরণের কথা বলছি
আমি ইতিহাস এবং স্বপ্নের কথা বলছি।

স্বপ্নের মত সত্যভাষণ ইতিহাস
ইতিহাসের আনন্দিত অভিজ্ঞান কবিতা
যে বিনীত সে স্বপ্ন দেখতে পারে না
যে অসুখী সে কবিতা লিখতে পারে না।
যে উদ্গত অংকুরের মত আনন্দিত
সে কবি
যে সত্যের মত স্বপ্নভাবী
সে কবি
যখন মানুষ মানুষকে ভালবাসবে
তখন প্রত্যেকে কবি।



আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি বিচলিত বর্তমান
এবং অস্তিম সংগ্রামের কথা বলছি।

খন্ডযুদ্ধের বিরতিতে
আমরা ভূমি কর্ষণ করেছি।
হত্যা এবং ঘাতকের সংকীর্ণ ছায়াপথে
পরিচ্ছন্ন বীজ বপন করেছি।
এবং প্রবহমান নদীর সুকুমার দাক্ষিণ্যে
শস্যের পরিচর্যা করছি।

আমাদের মুখাবয়ব অসুন্দর
কারণ বিকৃতির প্রতি ঘৃণা
মানুষকে কুশ্রী করে দ্যায়।
আমাদের কণ্ঠস্বর রুঢ়
কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ
কণ্ঠকে কর্কশ করে তোলে।
আমাদের পৃষ্ঠদেশে নাক্ষত্রিক ক্ষতচিহ্ন
কারণ উচ্চারিত শব্দ আশ্রয় বিশ্বাসঘাতক
আমাদেরকে বারবার বধ্যভূমিতে উপনীত করেছে।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমার সন্তানেরা
আমি তোমাদের বলছি।
যেদিন প্রতিটি উচ্চারিত শব্দ
সূর্যের মত সত্য হবে
সেই ভবিষ্যতের কথা বলছি,
সেই ভবিষ্যতের কবিতার কথা বলছি।
আমি বিষসর্প প্রভুদের
চির প্রয়াণের কথা বলছি
দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের
পরিসমাপ্তির কথা বলছি
সুতীব্র ঘৃণার
চূড়ান্ত অবসানের কথা বলছি।

আমি সুপুরুষ ভালবাসার
সুকণ্ঠ সংগীতের কথা বলছি।

যে কর্ষণ করে
শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে।
যে মৎস্য লালন করে
প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে।
যে গাভীর পরিচর্যা করে
জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।
যে লৌহখন্ডকে প্রজ্জ্বলিত করে
ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।
দীর্ঘদেহ পুত্রগণ
আমি তোমাদের বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি
বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি
আমি আমার ভালবাসার কথা বলছি।
আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।

সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
সুপুরুষ ভালবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা
রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।

আমরা কি তাঁর মত কবিতার কথা বলতে পারবো
আমরা কি তাঁর মত স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।

আবুল হাসান

গোলাপের নীচে নিহত হে কবি কিশোর

গোলাপের নীচে নিহত হে কবি কিশোর আমিও ভবঘুরেদের প্রধান
ছিলাম।

জোৎস্নায় ফেরা জাগুয়ারা চাঁদ দাঁতে ফালা ফালা করেছে আমারও
প্রেমিক হৃদয়!

আমিও আমার প্রেমহীনতায় গণিকার কাছে ক্লান্তি
সঁপেছি

বাঘিনীর মুখে চুমু খেয়ে আমি বলেছি আমাকে উদ্ধার দাও!

সক্রেটিসের হেমলক আমি মাথার খুলিতে ঢেলে তবে পান করেছি মৃত্যু
হে কবি কিশোর

আমারও অনেক স্বপ্ন শহীদ হয়েছে জীবনে কাঁটার আঘাত সয়েছি
আমিও।

হৃদয়ে লুকানো লোহার আয়না ঘুরিয়ে সেখানে নিজেকে দেখেছি
পাণ্ডুর খুবই নিঃস্ব একাকী!

আমার পায়ের সমান পৃথিবী কোথাও পাইনি অভিমানে আমি
অভিমানে তাই

চক্ষু উপড়ে চড়ুইয়ের মতো মানুষের পাশে বারিয়েছি শাদা গুত্র পালক!

হে কবি কিশোর নিহত ভাবুক, তেয়ার দুঃখ আমি কি বুঝি না?

আমি কি জানি না ফুটপাতে কারা করুণ শহর কাঁধে তুলে নেয়?

তোমার তৃষ্ণা তামার পাত্রে কোন কবিতার ঝিলকি রটায় আমি কি
জানি না

তোমার গলায় কোন গান আজ প্রিয় আরাধ্য কোন করতলও হাতে লুকায়

আমি কি জানি না মাঝরাতে কারা মৃতের শহর কাঁধে তুলে নেয়?

আমারও ভ্রমণ পিপাসা আমাকে নারীর নাভিতে ঘুরিয়ে মেরেছে

আমিও প্রেমিক কুবাদুর গান স্মৃতি সমুদ্রে একা শাম্পান হয়েছি
আবার

সুন্দর জেনে সহোদরকেও সঘন চুমোয় আলুথালু করে খুঁজেছি
শিল্প।

আমি তবু এর কিছুই তোমাকে দেবো না ভাবুক তুমি সেরে ওঠো

তুমি সেরে ওঠো তোমার পথেই আমাদের পথে কখনও এসো না,

আমাদের পথ

ভীষণ ব্যর্থ আমাদের পথ।



জন্ম : ৪ আগস্ট ১৯৪৭

মৃত্যু : ২৬ নভেম্বর ১৯৭৫

ওয়েবলিংক

আবুল হাসানের জীবনী



আবুল হাসান

আমার হবে না, আমি বুঝে গেছি

ক্লাশভর্তি উজ্জ্বল সন্তান, ওরা জুড়ে দেবে ফুলস্কেপ সমস্ত কাগজ!
আমি বাজে ছেলে, আমি লাষ্ট বেঞ্চি, আমি পারবো না!
ক্ষমা করবেন বৃক্ষ, আপনার শাখায় আমি সত্য পাখি বসাতে পারবো না!
বানান ভীষণ ভুল হবে আর প্রফ সংশোধন করা যেহেতু শিখিনি
ভাষায় গলদঃ আমি কি সাহসে লিখবো তবে সত্য পাখি, সচ্চরিত্র ফুল?

আমার হবে না, আমি বুঝে গেছি, আমি সত্যি মূর্খ, আকাঠ!
সচ্চরিত্র ফুল আমি যত বাগানের মোড়ে লিখতে যাই, দেখি
আমার কলম খুলে পড়ে যায় বিষ পিপড়ে, বিষের পুতুল!



শীতে ভালোবাসা পদ্ধতি

কনক তুমি শীতে এবার কর্ডিগানটা পরো কেমন?

আমাকে তুমি শিখিয়ে দিয়ো লালঝুটো সেই পাখির নামটি?

কনক আমরা এবার শীতে নদীর তীরে হো হো হাসবো,
সন্কেবেলা তোমার চুলে শিশির ভরে রাখবো লক্ষ্মী
তোমার অনামিকায় কামড় দিয়ে আমি হঠাৎ আবার
ওযাহ-কী-দুষ্টু- ওঠে তোমার ওষ্ঠ ছোঁবো সকাল বেলায়
সূর্যোদয়ের কাছে কেবল শান্তি চাইবো, বুঝলে কনক

তোমার মাথা ধরাও আমি এক চুমুতে সারিয়া দেবো!



আবুল হাসান

বদলে যাও, কিছুটা বদলাও

কিছুটা বদলাতে হবে বাঁশী
কিছুটা বদলাতে হবে সুর
সাতটি ছিদ্দের সূর্য; সময়ের গাঢ় অন্তঃপুর
কিছুটা বদলাতে হবে

মাটির কনুই , ভাঁজ
রক্তমাখা দুঃখের সমাজ কিছুটা বদলাতে হবে...

বদলে দাও, তুমি বদলাও
নইলে এফুনি
টুকে পড়বে পাঁচজন বদমাশ খুনী ,
যেখান যেখানে পাবে
মেরে রেখে যাবে,
তোমার সংসার, বাঁশী, আঘাটার নাও ।
বদলে যাও, বদলে যাও, কিছুটা বদলাও!

আগুনে পুড়বে ভস্ম এবং শৃঙ্খল

আকাশকে বিক্ষত করো আকাশ তবুও আকাশ,
ফুলকে পোড়াও, ফুল তবু ফুল
কাগজের মতো ছেঁড়ো শাড়ী ও শাড়ী ছিঁড়বোই
কিন্তু নারী রয়ে যাবে,
নারী চিনবেই তার ভীষণ নারীকে ।
ফুলতো কাগজ নয় ছিঁড়ে ফেলবে,
আকাশ তো মানুষ নয় ক্ষত কোরবে ।

স্বাধীনতাকে যতবার তুমি পরাধীনতা করো
আর মানুষকে যতবার তুমি মারো
যতবার পরাও শৃঙ্খল
মানুষ তবুও তার বজ্র মুষ্টি থেকে আগুনের রক্ত ছুঁড়ে দেবে ।
আগুনে পুড়বে ভস্ম এবং শৃঙ্খল ।



আবুল হাসান

উচ্চারণগুলি শোকের



লক্ষি বউটিকে
আমি আজ আর কোথাও দেখি না,
হাটি হাটি শিশুটিকে
কোথাও দেখি না,
কতগুলি রাজহাঁস দেখি
নরম শরীর ভরা রাজহাঁস দেখি,
কতগুলি মুখস্থ মানুষ দেখি, বউটিকে কোথাও দেখি না
শিশুটিকে কোথাও দেখি না!

তবে কি বউটি রাজহাঁস?
তবে কি শিশুটি আজ
সবুজ মাঠের সূর্য, সবুজ আকাশ?

অনেক রক্ত যুদ্ধ গেলো,
অনেক রক্ত গেলো,
শিমুল তুলোর মতো
সোনালরূপো ছড়ালো বাতাস।

ছোটো ভাইটিকে আমি
কোথাও দেখিনা,
নরোম নোলক পরা বোনটিকে
আজ আর কোথাও দেখি না!

কেবল পতাকা দেখি,
কেবল উৎসব দেখি,
স্বাধীনতা দেখি,

তবে কি আমার ভাই আজ
ঐ স্বাধীন পতাকা?
তবে কি আমার বোন, তিমিরের বেদীতে উৎসব?



আবুল হাসান

নিঃসঙ্গতা

অতোটুকু চায় নি বালিকা!
অতো শোভা, অতো স্বাধীনতা!
চেয়েছিলো আরো কিছু কম,

আয়নার দাঁড়ে দেহ মেলে দিয়ে
বসে থাকা সবটা দুপুর, চেয়েছিলো
মা বকুক, বাবা তার বেদনা দেখুক!

অতোটুকু চায় নি বালিকা!
অতো হৈ রৈ লোক, অতো ভিড়, অতো সমাগম!
চেয়েছিলো আরো কিছু কম!

একটি জলের খনি
তাকে দিক তৃষ্ণা এখনি, চেয়েছিলো

একটি পুরুষ তাকে বলুক রমণী!



আবিদ আজাদ

এখন যে কবিতাটি লিখবো আমি

এখন যে কবিতাটি লিখবো আমি
সেই কবিতাটি এঙ্কুনি বাজেয়াপ্ত করা হবে
এঙ্কুনি বেআইনি বলে ঘোষিত হবে সেই কবিতার
প্রতিটি শব্দ
প্রতিটি দাঁড়ি কমা
প্রতিটি সেমিকোলন
এঙ্কুনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে সেই কবিতার প্রতিটি চরণ।

এখন যে কবিতাটি লিখবো আমি
তার জন্যে মুহূর্তের মধ্যে সারা দেশ জুড়ে নেমে আসবে আরো
একটি উত্থানের প্রাক-মুহূর্তের স্তব্ধতা
নেমে আসবে রাইফেলের নলের মতো
মৃত্যু -
আর সেই মৃত্যুর স্তব্ধতায় বাংলাদেশের আবহমান সবুজ রং
অন্ধকারের মতো কালো হতে হতে ভয়াল গর্জনে ফেটে পড়বে
সমুদ্রের মতো।

এখন যে কবিতাটি লিখবো আমি
তার জন্যে হঠাৎ বোমাবাজির পর
ভরদুপুরের ভীষণ ভৌতিক গলির মতো শান্ত হয়ে যাবে
আমাদের প্রিয়তম এই রাজধানী
বাজতে থাকবে চারিদিকে বুটের আওয়াজ
শুধু বুটের
আওয়াজ

এখন যে কবিতাটি লিখবো আমি
তার জন্যে নিমিষের মধ্যে সারা শহর জুড়ে শুরু হয়ে যাবে
খানাতল্লাশি
তার জন্যে আর্মি-ইন্টেলিজেন্স রুম থেকে বিমানবন্দরে ছড়িয়ে
দেওয়া হবে গোপন নির্দেশ



জন্ম : ১৩ নভেম্বর ১৯৫২

মৃত্যু : ২২ মার্চ ২০০৫

ওয়েবলিংক

স্মরণ



তার জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে বিমানের সমস্ত নির্দিষ্ট ফ্লাইট
তার জন্যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সারা দেশে জারি হয়ে যাবে
জরুরি অবস্থা –
এখন যে কবিতাটি লিখবো আমি
তার জন্যে এক্ষুনি দিকে দিকে এসে যাবে চেকপোস্ট
এক্সুনি শাহবাগের মোড়ে
টিকাটুলির তেমাথায়
ফার্মগেটের সামনে থামিয়ে দেওয়া হবে
সমস্ত চলন্ত বাস, কোচ আর কোস্টার
লাইন করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে সমস্ত রিকশা ও ঠেলাগাড়ি

আর মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে খানাতল্লাশি
চেক করা হবে সারি সারি যাত্রীদের শরীর
চেক করা হবে মহিলার চামড়ার ব্যাগ
চেক করা হবে কিশোরের খেলনার বল
চেক করা হবে গাড়ির পাদানির নিচ থেকে কার্পেটের অতল অবধি
চেক করা হবে সাইকেলচারী যুবকের প্লাস্টিকের থলি
চেক করা হবে বেতার ভবনের গেটে ঘোষিকার কণ্ঠ
তরুণ কবির বুকপকেট,
বলপেনের দাগভরা আঙুলের ভাঁজ
কেরানীর খাতা
অধ্যাপকের উড়োচুল
কৃষকের কোঁচড়
শ্রমিকের চোখ
পোড়া গাঁর স্কুল
গঞ্জের ক্যানভাসারের গলা
হকারের বগল
গরু-পাইকারের খতি
বেশ্যাপাড়ার দাগী-খুনির লুঙ্গির গাঁট
সেন্ট্রাল জেলের সব সেল
রেশনকার্ডের পরতে পরতে
এমনকি মুদাফরাশের জবানবন্দির ভেতরেও চলবে তল্লাশি

এখন যে কবিতাটি লিখবো আমি
তার গতি রোধ করতে গিয়ে সীমান্ত পুলিশের হাতে



ধরা পড়বে কয়েক লক্ষ টাকার গুঁইসাপের চামড়া
তার গতি রোধ করতে গিয়ে সীমান্তরক্ষীর হাতে
আটকা পড়বে তিন জন চোরাচালানিসহ কয়েক লক্ষ টাকার
বিদেশী শাড়ি

এখন যে কবিতাটি লিখবো আমি
তার জন্যে মুহূর্তের মধ্যে ছদ্মবেশে টহল দিতে শুরু করবে
পুলিশ ভ্যান
তার জন্যে তছনছ হয়ে যাবে ইউনিভার্সিটির হলগুলি
তার জন্যে প্রচন্ড সন্ধ্যাবেলা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের
টিভি রুমের ভিতর থেকে সন্দেহবশত ধরে নিয়ে যাবে
দুজন ছাত্রকে
তার জন্যে বস্তিতে বস্তিতে আগুনের মতো
লেলিয়ে দেওয়া হবে গুন্ডাপান্ডা -

এখন যে কবিতাটি লিখবো আমি
সেই কবিতাটি যখন পড়বে কোনো এক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা
আমি জানি তার ব্যর্থ কাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে তখন অসমাপ্ত
মুক্তিযুদ্ধ ফেলবে দীর্ঘশ্বাস
সেই কবিতাটি যখন পড়বেন চশমার-কাচ-ফাটা গ্রামের কোনো
এক প্রৌঢ় স্কুল মাস্টার
আমি জানি তার শূন্য চোখের সামনে তখন ভেসে উঠবে
এক শীতের ভোরে শিমুলগাছের নিচে উদ্ধার-করা হঠাৎ
নিখোঁজ হয়ে-যাওয়া তার ছেলের লাশ -
সেই কবিতাটি যখন পড়বে কোনো এক কলেজ ছাত্রী
আমি জানি তখন তার মনে পড়বে প্রেমিকের উষ্ণ চুম্বনের ভিতরে
আবিষ্কার করা
প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণের আলোড়ন নয়
তার মনে পড়বে পলায়নপর এক যুবকের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের
কথা -
সেই কবিতাটি যখন পড়বেন কোনো চল্লিশোত্তীর্ণ মহিলা
আমি জানি তার বিগত দিনের পশমকাঁটায় তখন জেগে উঠবে আকণ্ঠ
পরিতাপ
সেই কবিতাটি যখন পড়বেন কোনো এক বজ্জাত অধ্যাপক



আমি জানি তখন তার মনে পড়বে তার হওয়ার কথা ছিল পুলিশ
কিন্তু তিনি হয়ে গেছেন অধ্যাপক –
সেই কবিতাটি যখন পড়বেন কোনো এক পত্রিকার সম্পাদক
আমি জানি তখন ঘুমের মধ্যে তার মাথার ভিতর থেকে বেরিয়ে
আসবে একটি ছায়ামূর্তি
আর তার মনে পড়বে – তার হওয়ার কথা ছিল সওদাগরি
অফিসের অ্যাকাউন্টেন্ট
কিন্তু তিনি হয়ে গেছেন সম্পাদক

এখন যে কবিতাটি লিখব আমি
তার জন্যে দৈনিক পত্রিকাগুলোর নাইট শিফটের টেবিলে টেবিলে
গুঞ্জরিত হয়ে ফিরবে চাপা গুঞ্জন
তার জন্যে চাকরি যাবে তথ্য সচিবের
তার জন্যে আপন পদে ইস্তফা দিতে হবে তথ্যমন্ত্রীকে

এখন যে কবিতাটি লিখব আমি
তার জন্যে অপেক্ষা করছে
দুটো লোহার ঠান্ডা হাতকড়া
তার জন্যে অপেক্ষা করছে
একটি ঘাতক ছুরি
তার জন্যে অপেক্ষা করছে
ভাড়া করা গুন্ডাদের একটি কালো গাড়ি
তার জন্যে অপেক্ষা করছে
উচ্চাভিলাষী কয়েকজন জেনারেলের ষড়যন্ত্রের
একটি নির্মম নির্জন মধ্যরাত্রি –

এখন যে কবিতাটি লিখব আমি
তার জন্যে আমার সম্ভানের জন্মের যন্ত্রণা মুখে নিয়ে
আমার প্রিয়তমা নারীর মতো
অপেক্ষা করছে আমার বাংলাদেশ?



আবিদ আজাদ

যে শহরে আমি নেই আমি থাকবো না



যে শহরে আমি নেই আমি থাকবো না সে শহরে যুদ্ধ শেষের
ভাঙা-পোড়ো একটা এয়ারপোর্টের মতো বেঁচে থাকবে তুমি
তোমাকে ঘিরে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে স্কার্ট-পরা বুড়ি
বার্মিজ মহিলার মতো ভৌতিক নির্জনতা;
তোমাকে ঘিরে সারাক্ষণ ঝুলে থাকবে তছনছ তারের জটিলতা
লতাগুল্লুময় ক্রেনের কংকাল, জং পড়া লোহালঙ্কার আর হিংস্র
ঘাসের মধ্যে ধু-ধু করবে তোমার জীবন
ভয়াব্রত সব মিলিটারী ভ্যান আর উল্টে থাকা ট্রলির পাশে ক্ষত-বিক্ষত
একটা চাঁদ ওঠা রানওয়ের মতো
তুমি মুখ লুকিয়ে রাখবে গা ছম-ছম করা জ্যোৎস্নায়।
যে শহরে আমি নেই আমি থাকবো না সে শহরে জনহীন কোন
পেট্রোল পাম্পের দেয়াল ঘেঁষে
একটা মরা শিউলি গাছের মতো বেঁচে থাকবে তুমি
তোমাকে ঘিরে হা-হা করবে নিদাঘ রাত
দেখবে পর্যুদস্ত একটা হেলমেটের ফাঁটল দিয়ে দিয়ে মাথা
তুলছে একগুচ্ছ সবুজ তৃণ
শুনবে ধ্বংসস্তম্ভের মধ্যে অর্ধডোবা সূর্যাস্তের মতো
আগুনলাগা বিলুপ্তপ্রায় লাউঞ্জ থেকে ভেসে আসছে
প্রেত হাসির শব্দ
আর তোমাকে ঘিরে নামবে এক জোড়া জনশূন্য বুটের স্তব্ধতা।
যে শহরে আমি নেই আমি থাকবো না সে শহরে প্রতিদিন
দুর্ঘটনা দিয়ে গুরু হবে তোমার ভোর
সকাল সাতটা থেকে অনবরত টেলিফোনে আসতে থাকবে
'সান স্ট্রীকে'র সংবাদ
তোমার পাশের সাততলা জান্না থেকে লাফিয়ে পড়বে
কোঁকড়া চুলের যুবক
একদিন গলায় খুর চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়বেন সেই বুড়ো
সবুজ রঙ্গের গলাবন্ধ পরে স্টিক হাতে যিনি মর্নিংওয়াকে
বেরুতেন রোজ
একটি কিশোরী তার আব্বার রেজর থেকে লুকিয়ে নেবে রোড



গভীর জ্যোৎস্নাক্ষিত স্ট্রীটের মাথায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়বে
কালো রঙের এটা গাড়ি
একজন মানুষ শিরিষ গাছের ভিতরে টিপে ধরবে আরকেজন মানুষের গলা
পার্কের ঝরাপাতার উপর সারারাত ধরে শিশিরে ভিজে যাবে
মৃত তরুণীর হাঁটুর ভাঁজ।

যে শহরে আমি নেই আমি থাকবো না সে শহরে চরম
দুর্ভোগ্যতম হয়ে বেড়ে উঠবে তোমার বিষণ্ণ সন্তান
বার বার ক'রে বদলাতে হবে তার ঝাপসা চোখের চশমার গ্লাস
তুমি তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে ভোরের ইস্কুলে
কিন্তু কাঁধে ব্যাগ নিয়ে আর কোনদিন ফিরে আসবে না
নীল হাফ প্যান্ট পরা তোমার ছেলে, আসবে না, আসবে না
তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে ইস্কুল বাড়ির সামনে : রাস্তার ওপারে।
যে শহরে আমি নেই আমি থাকবো না সে শহরে নিয়মিত
দুধের বোতল দিয়ে যাবে গাড়ি
কিন্তু সে দুধে মেশানো থাকবে গুঁড়ো বিষ
তোমার ফ্রিজের ভিতরে মরে পড়ে থাকবে শাদা ইঁদুর
তোমার ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় বসে থাকবে একটা তেলাপোকা
তার রঙ হবে মারাত্মক রকম লাল
তোমার ওয়ারড্রোবের ভিতর থেকে হ্যাঙ্গার-শুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়বে
মধ্য রাতে কাপড়-চোপড়।

তুমি পালাতে চাইবে পালাতে চাইবে পালাতে চাইবে
ছুটে পালাবে
ছুটবে
ছুটতে ছুটতে তুমি নিচতলার জানালার একখণ্ড পর্দার
মতো আটকে যাবে বার বার
তুমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে ঘুমের ভিতর
কিন্তু মৃতশহর শাণিত ক'রে রাখবে তার সমস্ত রাস্তার বালি
তারার ভিতর থেকে সারারাত ধরে খ'সে পড়বে চুন
হঠাৎ লক্ষ লক্ষ হাতের করতালি বেজে উঠবে আতংকিত মোড়ে মোড়ে
দেখবে শাদা ট্রাফিক দাঁড়িয়ে আছে বাজপড়া তাল গাছের মতো
তার হাত দু'টো ঝুলছে চাঁদহীন মরা ডালের মতো
চোখের লোমহর্ষক দুটো গর্তের ভিতর দিয়ে চলেছে
বিষাক্ত পিঁপড়ের বাহিনী



তার মাথার ফাটলে গজিয়েছে একটা বটচারী
তোমার ভয়াবহ চিৎকারে শুধু সেই মৃত ট্রাফিকের লাল
হা-এর ভিতর থেকে উড়ে যাবে একটা বনটিয়া।
যে শহরে আমি থাকবো না সে শহরে
লিফট তোমাকে নিয়ে সোজা নেমে যাবে পাতালে
তোমাকে নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো
পার্কের ধারের খাদে ছিটকে পড়বে বাস
লেকের হাঁসগুলি গুলির মতো ঠুকরে খাবে মানুষের চোখ
আর খুব বিকাল বেলায় তুমি ক্লান্ত হ'য়ে
ক্লান্ত হ'য়ে
ফিরবে ঘরে
কিন্তু তোমার ঘরের নিঃসঙ্গ দরোজা
তোমাকে খুলে দিবে হু-হু শীতল প্রান্তর
তোমার সোফা তোমাকে বসতে দিবে না
পাঠিয়ে দেবে বিছানায়
কিন্তু বিছানা তোমাকে শুতে দেবে না
দাঁড় করিয়ে হিমশীতল জানালায়
তুমি বাথরুমে যাবে, শাওয়ার খুলে দিলে ঝরবে রক্ত
তুমি বেসিনে নুয়ে পড়বে, পানির ঝাপটা দিতেই মনে হবে
কার গলা যেন পাঠিয়ে দিচ্ছে যক্ষার ফুল
তুমি ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে,
দেখবে বিভৎস চিড় ধরে আছে আয়নায়।
সেই চিড় ধরা আয়নার ভিতরে তারপর ক্রমশঃ
হারিয়ে যাবে তোমার আত্ননাদ
আর তোমার মনে হবে, আমি নেই।



আল মাহমুদ

বাতাসের ফেনা

কিছুই থাকে না দেখো, পত্র পুষ্প গ্রামের বৃদ্ধরা
নদীর নাচের ভঙ্গি, পিতলের ঘড়া আর হুকোর আগুন
উঠতি মেয়ের বাঁক একে একে কমে আসে ইলিশের মৌসুমের মতো
হাওয়ায় হলুদ পাতা বৃষ্টিহীন মাটিতে প্রান্তরে
শব্দ করে ঝরে যায়। ভিনদেশী হাঁসেরাও যায়
তাদের শরীর যেন অর্বুদ বুদ্বুদ
আকাশের নীল কটোরায।

কিছুই থাকে না কেন? করোগেট, ছন কিংবা মাটির দেয়াল
গায়ের অক্ষয় বট উপড়ে যায় চাটগাঁর দারুণ তুফানে
চিড় খায় পলেন্তুরা, বিশ্বাসের মতন বিশাল
হুড়মুড় শব্দে অবশেষে
ধসে পড়ে আমাদের পাড়ার মসজিদ!

চডুইয়ের বাসা, প্রেম, লতাপাতা, বইয়ের মলাট।
দুমড়ে মুচড়ে খসে পড়ে। মেঘনার জলের কামড়ে
কাঁপতে থাকে ফসলের আদিগন্ত সবুজ চিৎকার
ভাসে ঘর, ঘড়া-কলসী, গরুর গোয়াল
বুবুর স্নেহের মতো ডুবে যায় ফুল তোলা পুরোনো বালিশ।
বাসস্থান অতঃপর অবশিষ্ট কিছুই থাকে না
জলপ্রিয় পাখিগুলো উড়ে উড়ে ঠোঁট থেকে মুছে ফেলে বাতাসের ফেনা।

কাব্যগ্রন্থ : সোনালী কাবিন



জন্ম : ১১ জুলাই ১৯৩৬

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
বইয়ের তালিকা
বেঙ্গলিউইকি পেইজ
ফেসবুক গ্রুপ



আল মাহমুদ

ত্যাগে দুঃখে

আজকাল চোখে আর অন্য কোনো স্বপ্নই জাগে না ।
কবিতার কথা বুঝি, কবিতার জন্য বহুদূর একাকী গিয়েছি
পদচারণার স্মৃতি সারাদিন দুঃখবোধ ঐকান্তিক সখ্যতা ভেঙেছে
ত্যাগে দুঃখে ভরে আছে সামান্য পড়ার ঘর
সন্তানসহ দুঃখী সঙ্গিনীর মুখ ।

অবোধ বাল্যেও নাকি একটা ছোট কাপও ভাঙিনি—
আমার আন্মা প্রায়ই আমার বোনের কাছে শৈশব শোনান ।
সুন্দর ফ্লাওয়ার ভাসে জ্যাস্ত পাখির ডানা কবিতার ছন্দ ইত্যাদি
কেন জানি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমি
কিছুতেই ভাঙতে পারি না ।

ক্রিশেন্থিমাম নাকি ইতস্তত ছড়িয়ে লাগালে
অবশেষে উদ্যান বড় সুন্দর দেখায় । কই, আমি তো এখনও
আমার উদ্ভিদগুলো সাজিয়ে লাগাই ।

কাব্যগ্রন্থ : কালের কলস



আহসান হাবীব

দোতলার ল্যাভিং মুখোমুখি ফ্ল্যাট ।
একজন সিঁড়িতে, একজন দরজায়



জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭
মৃত্যু : ১০ জুলাই ১৯৮৫

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
আহসান হাবীবের জীবনী
বাঙালির ট্রাজিক যোদ্ধা

- : আপনারা যাচ্ছেন বুঝি?
- : চলে যাচ্ছি, মালপত্র উঠে গেছে সব ।
- : বছর দুয়েক হল, তাই নয়?
- : তারও বেশী । আপনার ডাক নাম শানু, ভালো নাম?
- : শাহানা, আপনার?
- : মাবু ।
- : জানি ।
- : মাহবুব হোসেন । আপনি খুব ভালো সেলাই জানেন ।
- : কে বলেছে । আপনার তো অনার্স ফাইন্যাল, তাই নয়?
- : এবার ফাইন্যাল ।
- : ফিজিও-এ অনার্স ।
- : কী আশ্চর্য! আপনি কেন ছাড়লেন হঠাৎ
- : মা চান না । মানে ছেলেদের সঙ্গে বসে...
- : সে যাক গে, পা সেরেছে?
- : কী করে জানলেন?
- : এই আর কি! সেরে গেছে?
- : ও কিছুনা , প্যাসেজটা পিছলে ছিল মানে...
- : সত্যি নয় । উচু থেকে পড়ে গিয়ে...
- : ধ্যাৎ । খাবার টেবিলে রোজ মাকে অতো জ্বালানো কি ভালো?
- : মা বলেছে?
- : শুনতে পাই । বছর দুয়েক হল, তাই নয়?
- : তারো বেশী । আপনার টবের গাছে ফুল এসেছে?
- : নেবেন? না থাক । রিকসা এল, মা এলেন , যাই ।
- : আপনি সন্ধ্যা বেলা ওভাবে কখনও পড়বেন না,
চোখ যাবে, যাই ।
- : হলুদ শার্টের মাঝখানে বোতাম নেই, লাগিয়ে নেবেন, যাই ।
- : যান, আপনার মা আসছেন । মা ডাকছেন, যাই ।



আহসান হাবীব

আমি কোনো আগন্তুক নই



আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পূবের পুকুর, তার বাকড়া ডুমুরের পালে
স্থিরদৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশী পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই, আমি
ছিলাম এখানে, আমি স্বাপ্নিক নিয়মে
এখানেই থাকি আর
এখানে থাকার নাম সর্বত্রই থাকা –
সারা দেশে।

আমি কোনো আগন্তুক নই। এই
খর রৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লাস্ত বিকেলের
পাখিরা আমাকে চেনে
তারা জানে আমি কোনো অনাত্মীয় নই।
কার্তিকের ধানের মঞ্জুরী সাক্ষী
সাক্ষী তার চিরোল পাতার
টলমল শিশির, সাক্ষী জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা

নিশিন্দার ছায়া
অকাল বার্ষিক্যে নত কদম আলী
তার ক্লাস্ত চোখের আঁধার
আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন
একজন। আমি
জমিলার মা'র
শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
সে আমাকে চেনে
হাত রাখো বৈঠায় লাঙ্গলে, দেখো
আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন
গভীর। দেখো
মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে
লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।
আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কোনো আগন্তুক
নই।

দু'পাশে ধানের ক্ষেত
সরু পথ
সামনে ধু ধু নদীর কিনার
আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি এই উধাও নদীর
মুগ্ধ এক অবোধ বালক।



কাজী নজরুল ইসলাম

সাম্যবাদী



জন্ম : ২৬ মে ১৮৯৯
মৃত্যু : ২৯ আগস্ট ১৯৭৬

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
নজরুল ডট অর্গ
কাজী নজরুল ইসলাম ডট অর্গ
নজরুল গীতি
ওয়েবদুনিয়ায় নজরুল
বাংলা সিনেমার নজরুল

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্ৰীষ্টান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?— পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কনফুসিয়াস? চার্বআখ চেলা? ব'লে যাও, বলো আরো!
বন্ধু, যা-খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক—
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব প'ড়ে যাও, যত সখ—
কিস্ত্র, কেন এ পন্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর কষাকষি? — পথে ফুটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকল দেবতার।
কেন খুঁজে ফের' দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!

বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে ব'সে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হ'ল মেঘের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি'।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহবান,
এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।



কাজী নজরুল ইসলাম

কাভারী হুশিয়ার!

১

দুর্গম গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার
লজ্জিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার!!

২

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্বীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান!
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুক পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে, নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার!!

৩

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাভারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
“হিন্দু না ওরা মুসলিম?” ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাভারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা’র!

৪

গিরি-সংকট, ভীরা যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ
কাভারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
‘করে হানাহানি, তবু চল টানি’, নিয়াছ যে মহাভার!

৫

কাভারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হ’ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বীর।

৬

ফাঁসির মঞ্চ যারা গেয়ে গেল জীবনের জয়গান,
আসি’ অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে দ্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাভারী হুশিয়ার!

কৃষ্ণনগর; ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩



কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী



বল বীর -
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর -
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটাকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর -
আমি চির উন্নত শির!

আমি চিরদূর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি দুর্বীর,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না কো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে বাড় অকাল-বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর -
চির-উন্নত মম শির!

আমি বাঞ্ছা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সমূখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,



আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ ।
আমি হাস্যর, আমি ছায়াট, আমি হিন্দোল,

আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিৎ দিয়া দিই তিন দোল;

আমি চপলা-চপল হিন্দোল ।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী আমি ভীতি এ ধরিত্রীর;
আমি শাসন-দ্রাসন, সংহার আমি উষ্ম চির-অধীর!
বল বীর -
আমি চির উন্নত শির!

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্মদ, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হয় হর্দম ভরপুর মদ ।

আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি ।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান ।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর রণ-তুর্য;
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মস্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধীর ।
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর ।
বল বীর -
চির - উন্নত মম শির!

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ লুণ গৈরিক ।
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্গিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,

আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার,
আমি পিণাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।
আমি প্রাণ খোলা হাসি উল্লাস, - আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্মাস,
আমি মহা প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু গ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরণ্য খুনের তরণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভঞ্নের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহা কল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-উর্মির হিন্দোল-দোল!

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণু, তন্ত্রী-নয়নে বহি
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্য!
আমি উন্মূন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা হতাশ আমি হতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয় লাঞ্চিত বুকে গতি ফের
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়
চিত চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম প্রকাশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা'র কাঁকন-চুড়ির কন-কন!
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচড় কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিনী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্ধ রবি
আমি মরু-নির্ব্যর বর বর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিত্তে চেতন,

আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া

স্বর্গ মর্ত্য-করতলে,

তাজী বোররাক আর উচ্চৈশ্বর্য বাহন আমার

হিম্মত-হেঁষা হেঁকে চলে!

আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াগ্নি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,

আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!

আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া দিয়া লক্ষ,

আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমিকম্প।

ধরি বাসুকির ফণা জাপটি' -

ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'।

আমি দেব শিশু, আমি চঞ্চল,

আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব মায়ের অঞ্চল!

আমি অফিঁয়াসের বাঁশরী,

মহা- সিন্ধু উতলা ঘুমঘুম

ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম

মম বাঁশরীর তানে পাশরি'

আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।

আমি রণে উঠি' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,

ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!

আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,

কভু ধরনীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা-

আমি ছিনিয়া আনিব বিষু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!

আমি অন্যায়, আমি উদ্ধা, আমি শনি,

আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!

আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,

আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!



আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মাথিয়া ফিরি স্বর্গ-পাতাল মর্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।
মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না -
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না -
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বৃকে ঐকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বৃকে ঐকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী-বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর -
বিশ্ব ছাড়িয়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!



কাজী নজরুল ইসলাম

সাহেব ও মোসাহেব



সাহেব কহেন, “চমৎকার! সে চমৎকার!”
মোসাহেব বলে, “চমৎকার সে হতেই হবে যে!
হুজুরের মতে অমত কার?”

সাহেব কহেন, “কী চমৎকার,
বলতেই দাও, আহা হা!”
মোসাহেব বলে, “হুজুরের কথা শুনেই বুঝেছি,
বাহা বাহা বাহা হা!”

সাহেব কহেন, “কথাটা কি জান? সেদিন -”
মোসাহেব বলে, “জানি না আবার?
ঐ যে, কি বলে, যেদিন -”

সাহেব কহেন, “সেদিন বিকেলে
বৃষ্টিটা ছিল স্বপ্ন।”
মোসাহেব বলে, “আহা হা, শুনেছ?
কিবা অপরূপ গল্প!”

সাহেব কহেন, “আরে ম’লো! আগে
বলতেই দাও গোড়াটা!”
মোসাহেব বলে, “আহা-হা গোড়াটা! হুজুরের
গোড়া!
এই, চুপ, চুপ ছোঁড়াটা!”

সাহেব কহেন, “কি বলছিলাম,
গোলমালে গেল গুলায়ে!”
মোসাহেব বলে, “হুজুরের মাথা! গুলাতেই
হবে।
দিব কি হস্ত বুলায়ে?”

সাহেব কহেন, “শোনো না! সেদিন

সূর্য উঠেছে সকালে!”
মোসাহেব বলে, “সকালে সূর্য? আমরা কিন্তু
দেখি না কাঁদিলে কোঁকালে!”

সাহেব কহেন, “ভাবিলাম, যাই,
আসি খানিকটা বেড়ায়ে,”
মোসাহেব বলে, “অমন সকাল! যাবে কোথা
বাবা,
হুজুরের চোখ এড়ায়ে!”

সাহেব কহেন, “হ’ল না বেড়ানো,
ঘরেই রহিনু বসিয়া!”
মোসাহেব বলে, “আগেই বলেছি! হুজুর কি
চাষা,
বেড়াবেন হাল চষিয়া?”

সাহেব কহেন, “বসিয়া বসিয়া
পড়েছি কখন বিমায়ো!”
মোসাহেব বলে, “এই চুপ সব! হুজুর বিমান!
পাখা কর, ডাক নিমাইএ”

সাহেব কহেন, “বিমাইনি, কই
এই ত জেগেই রয়েছে!”
মোসাহেব বলে, “হুজুর জেগেই রয়েছেন, তা
আগেই সবারে কয়েছি!”

সাহেব কহেন, “জাগিয়া দেখিনু, জুটিয়াছে যত
হনুমান আর অপদেব!”
“হুজুরের চোখ, যাবে কোথা বাবা?”
প্রণামিয়া কয় মোসাহেব।।



কাজী নজরুল ইসলাম

মানুষ

গাহি সাম্যের গান –

মানুষের চেয়ে কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান ,
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি ।

পুজারী, দুয়ার খোল,

ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পুজার সময় হলো!

স্বপ্ন দেখিয়া আকুল পুজারী খুলিল ভজনালয়

দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়!

জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ

ডাকিল পাশ্চ, ‘দ্বার খোল বাবা, খাইনা তো সাত দিন!’

সহসা বন্ধ হল মন্দির , ভুখারী ফিরিয়া চলে

তিমির রাত্রি পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!

ভুখারী ফুকরি’ কয়,

‘ঐ মন্দির পুজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!’

মসজিদে কাল শিরনী আছিল, অটেল গোস্তু রুটি

বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি!

এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে-আজারির চিন্

বলে, ‘বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!’

তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা – ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,

ভুখা আছ মর গে-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?’

ভুখারী কহিল, ‘না বাবা!’ মোল্লা হাঁকিল- ‘তা হলে শালা

সোজা পথ দেখ!’ গোস্তু-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা!

ভুখারী ফিরিয়া চলে,

চলিতে চলিতে বলে’

‘আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তেমায়ে কভু,

আমার ক্ষুধার অনু তা’বলে বন্ধ করোনি প্রভু!

তব মজসিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী,

মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী!’

কোথা চেঙ্গিস, গজনী-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ;



ভেঙ্গে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার!
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায় কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা র'বে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!
হায় রে ভজনালয়
তোমার মিনারে চড়িয়া ভন্ড গাহে স্বার্থের জয়!
মানুষেরে ঘৃণা করি
ও' কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি
ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে।
পুজিছে গ্রন্থ ভন্ডের দল! -মুর্খরা সব শোনো
মানুষ এনেছে গ্রন্থ, -গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।
আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর, -বিশ্বের সম্পদ,
আমাদেরি এরা পিতা পিতামহ, এই আমাদের মাঝে
তাদেরি রক্ত কম-বেশী করে প্রতি ধমনীতে বাজে!
আমরা তাদেরি সন্তান, জ্ঞাতি, তাদেরি মতন দেহ
কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ।
হেস না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম
আমিই কি জানি কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম।
হয়ত আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদি ঈসা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা?
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়তো উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি!
অথবা হয়ত কিছুই নহে সে, মহান উচ্চ নহে,
আছে ক্লেদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ - দহে,
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!

হয়ত ইহারি ঔরসে ভাই ইহারই কুটীর -বাসে
জন্মিছে কেহ-জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে!
যে বাণী আজিও শোনেনি জগৎ, যে মহাশক্তিধরে
আজিও বিশ্ব দেখেনি - হয়ত আসিছে সে এরই ঘরে!
ও কে? চন্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!
ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চন্ডাল, কাল হতে পারে মহাযোগী-সম্রাট,



তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দী পাঠ ।
রাখাল বলিয়া কারে কর হেলা, ও-হেলা কাহারে বাজে!
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে!
চাষা বলে কর ঘৃণা!
দেখো চাষা রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কি না!
যত নবী ছিল মেঘের রাখাল, তারও ধরিল হাল
তারাই আনিল অমর বাণী – যা আছে র'বে চিরকাল ।
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিনী,
তারি মাঝে কবে এলো ভোলা -নাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি!
তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে
দ্বার দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে ।
সে মোর রহিল জমা -
কে জানে তোমারে লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কি না ক্ষমা!
বন্ধু, তোমার বুক-ভরা লোভ দু'চোখ স্বার্থ ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলী ।
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা মথিত সুধা
তাই লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোনখানে!
তোমারি কামনা-রাণী
যুগে যুগে পশু ফেলেছে তোমায় মৃত্যু বিবরে টানি ।



কাজী নজরুল ইসলাম

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।



আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্লবে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার - ভাঙা কল্লোলে।
আসল হাসি, আসল কাঁদন
মুক্তি এলো, আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আসল উদাস, শ্বসল হতাশ
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস,
গগন ফেটে চক্রে ছোটো, পিণাক-পাণির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,

আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তুণ
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে
গো দিগ বালিকার পীতবাসে;

আজ রঙ্গন এলো রক্তপ্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!
আজ কপট কোপের তুণ ধরি,
ঐ আসল যত সুন্দরী,



কারণর পায়ে বুক ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে!

তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে-তাও-মুখ-ফোটে-না' বাণীর বীণা মোর পাশে
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!

আজ আসল উষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আসল নিকট, আসল সুদূর
আসল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগলা-গাজন-উচ্ছ্বাসে!
ঐ আসল আশিন শিউলি শিথিল
হাসল শিশির দুবঘাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ জাগল সাগর, হাসল মরু
কাঁপল ভূধর, কানন তরু
বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বামপাশে।
মন ছুটছে গো আজ বল্লাহারা অশ্ব যেন পাগলা সে।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!!



কাজী নজরুল ইসলাম

বর্ষা বিদায়

ওগো বাদলের পরী!

যাবে কোন্ দূরে, ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী!

ওগো ক্ষণিকা পুব অভিসার ফুরাল কি আজি তব?

পহিল্ ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন দেশ অভিনব?



কবিতাটি সওগাতের ভাদ্র ১৩৩৫
সংখ্যার প্রথম প্রকাশ পায়। ১৯২৯
সালে ‘চক্রবাক’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত
হয়। এই কবিতা রচনা করা হয়
বেগম ফজিলতুন্নেসার বিলেত
গমনের ঘটনাকে স্মরণীয় করে
রাখায় উদ্দেশ্যে। ফজিলতুন্নেসা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম
ছাত্রী। নজরুলের সাথে কাজী
মোতাহার হোসেনের মাধ্যমে তার
ফজিলতুন্নেসার সাথে যোগাযোগ
হয়। নজরুল ফজিলতুন্নেসাকে
মনপ্রাণ সঁপে ভালবেসেছিলেন,
কিন্তু ফজিলতুন্নেসা প্রতিবার
নজরুলকে প্রত্যাক্ষান করেন। তার
প্রতি নজরুলের অনুরাগের প্রমাণ
পাওয়া যায় কাজী মোতাহার
হোসেনকে লেখা নজরুলের চিঠি
গুলোতে।

তোমার কপোল-পরশ না পেয়ে পাভুর কেয়া-রেণু,
তোমারে স্মরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কাঁদে বেণু।

কুমারীর ভীৰু বেদনা-বিধুর প্রণয় অশ্রু সম
ঝরিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশ ভোরে অনুপম।

ওগো ও কাজল মেয়ে,

উদাস আকাশ ছলছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে।

কাশফুল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে

তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।

ওগো জলের দেশের কন্যা। তব ও বিদায় পথে

কাননে কাননে কদম-কেশর ঝরিছে প্রভাত হ’তে।

তোমার আদরে মুকুলিতা হয়ে উঠিল যে ব্লুরী

তরুর কণ্ঠ জড়াইয়া তা’রা কাঁদে নিশিদিন ভরি।

‘বৌ-কথা-কও’ পাখি

উড়ে গেছে কোথা, বাতায়নে বৃথা বউ করে ডাকাডাকি।

চাঁপার গেলাস গিয়াছে ভাঙিয়া, পিয়াসী মুধুপ এসে’

কাঁদিয়া কখন গিয়াছে উড়িয়া কমল-কুমদী দেশে।

তুমি চলে যাবে দূরে,

ভাদরের নদী দুকূল ছাপায়ে কাঁদে ছলছল সুরে!

যাব যবে দূর হিম-গিরি শিরে, ওগো বাদলের পরী,
ব্যথা ক’রে বুক উঠিবে না কভু সেথা কাহারেও স্মরি?

সেথা নাই জল, কঠিন তুষার, নির্মম শুভ্রতা-

কে জানে কি ভাল বিধুর ব্যথা- না মধুর পবিত্রতা।

সেথা মহিমার উর্ধ্ব শিখরে নাই তরলতা হাসি,

সেথা রজনীর রজনীগন্ধা প্রভাতে হয় না বাসি।

সেথা যাও তব মুখর পায়ের বরষা-নূপুর খুলি’,

চলিতে চকিতে চমকি’ উঠ না, কবরে উঠে না দুলি’।

সেথা র’বে তুমি ধেয়ান-মগ্না তাপসিনী অচপল,

তোমার আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি ‘ফটিক জল’।

কাজী নজরুল ইসলাম

আমার কৈফিয়ৎ



বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী',
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুজে তাই সই সব!
কেহ বলে, 'তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাই পাবে কবি ভবীর সাথে হে!
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে-বাণী কই কবি?'
দুঃখিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী!

কবি বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা প'ড়ে শ্বাস ফেলে।
বলে, কেজো ক্রমে হ'চ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাঁশ ঠেলে।
পড়েনাক' বই, ব'য়ে গেছে ওটা।
কেহ বলে বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা।
কেহ বলে মাটি হ'ল হ'য়ে মোটা জেলে ব'সে শুধু তাস খেলে।
কেহ বলে, তুই জেলে ছিলি ভালো, ফের যান তুই যা'স জেলে।

গুরু ক'ন, তুই করেছিস গুরু তলোয়ার দিয়ে দাঁড়ি চাঁচা।
প্রতি শনিবারই চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাঁড়িচাঁচা!'
আমি বলি 'প্রিয়ে, হাটে ভাঙি হাঁড়ি-'
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি।
সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা ক'ন, আড়ি চাচা!
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি, নাড়ি কাছা!

মৌ-লোভী যত মৌলভী আর 'মোল-লারা' ক'ন হাত নেড়ে,
দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে!
ফতোয়া দিলাম- কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও!
'আম পারা'- পড়া হাম-বড়া মোরা এখনও বেড়াই ভাত মেরে!
হিন্দুরা ভাবে, 'পাশী'-শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত-নেড়ে!

আনকোরা যত ননভায়োলেন্ট নন-কো'র দলও নন খুশী।
ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্' নাকি আমি, বিপ্লবী-মন তুষি।
'এটা অহিংস', বিপ্লবী ভাবে,



‘নয় চরকার গান কেন গা’বে?’
গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি-রাম ভাবে কনফুসি!
স্বরাজীরা ভাবে নারাজী, নারাজীরা ভাবে তাহাদের অঙ্কুশি’!

নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা! নারী ভাবে, নারী বিদ্বেশী।
‘বিলেত ফেরেনি?’ প্রবাসী- বন্ধু ক’ন, ‘এই তব বিদ্যে, ছি!’
ভক্তরা বলে, ‘নবযুগ-রবি!’-
যুগের না হই, হুজুগের কবি
বটি তো রে দাদা, আমি মনে ভাবি, আর ক’ষে কষি হৃদ-পেশী,
দু’কানে চশমা আঁটিয়া ঘুমানু, দিব্যি হ’তেছে নিদ্ বেশী!

কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু, আমিই কি বুঝি তার কিছু?
হাত উঁচু আর হ’ল না তো ভাই, তাই লিখি ক’রে ঘাড় নীচু!
বন্ধু! তোমরা দিলেনাক’ দান,
রাজ- সরকার রেখেছেন মান!
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব’লে অ-মূল্যে নেন। আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?

বন্ধু! তুমি তো দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে,
হাড় কালি হ’ল, শাসাতে নারিনু তবু পোড়া মন- বন্দীরে!
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে যে শিকল,
মেরে মেরে তারে করিল বিকল,
তবু যদি কথা শুনে সে পাগল! মানিল না রবি- গান্ধীরে।
হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফেরে নিশার আঁধারে বন চিরে!

আমি বলি, ওরে কথা শোন্ ক্ষ্যাপা, দিব্যি আছি স্ খোশহালে!
প্রায় ‘হাফ’- নেতা হ’য়ে উঠেছি স্, এবার এ দাঁও ফসকালে
‘ফুল’- নেতা আর হবিনে যে হায়!
বক্তৃতা দিয়া কাঁদিতে সভায়
গুঁড়ায়ে লক্ষা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঘোকা! সেই তালে
নিস্ তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি শেষকালে।

বোঝেনাক’ যে সে চারণের বেশে ফেরে দেশে দেশে গান গেয়ে
গান শুনে সবে ভাবে, ভাবনা কি! দিন যাবে এবে পান খেখে।
রবেনাক’ ম্যালেরিয়া মহামারী,



স্বরাজ আসিছে চ'ড়ে জুড়ি-গাড়ী,
চাঁদা চাই, তারা ক্ষুধার অনু এনে দেয়, কাঁদে ছেলে- মেয়ে।
মাতা কয়, ওরে চুপ্ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ্ চেয়ে!

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটুকু নুন,
বেলা ব'য়ে যায়, খায়নিক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠেনাক' তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

আমরা তো জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস।
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারি সমাজ।
মা'র বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ, খাও হে ঘাস!
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ!

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ- জ্বালা এই বুক,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না- বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো- যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত- লেখায় তাদের সর্বনাশ!

[সর্বহারা]



জসীম উদ্দীন

কবর



জন্ম : ১ জানুয়ারি ১৯০৩

মৃত্যু : ১৩ মার্চ ১৯৭৬

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ

জসিমউদ্দিন ডট অর্গ

লাভিং বেঙ্গল

মিলনসাগর

গুগল ভিডিও ১

গুগল ভিডিও ২

এই খানে তোর দাদির কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছি সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালি ঊষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙল লইয়া খেতে ছুটিলাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেলু দিশে।

বাপের বাড়িতে যাইবার কাল কহিত ধরিয়া পা
আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।
শাপলার হাটে তরমুজ বেচিছ পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যাবেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে!
হেস না হেস না মোন দাদু, সেই তামাক মাজন পায়,
দাদি যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিব্বাকম নিরালা!
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, আয় খোদা! দয়াময়,
আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্তু নসিব হয়।

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।

শত কাফনের, শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয়-আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

এইখানে তোর বাপজি ঘুমায়, এইখানে তোর মা,
কাঁদছিস তুই? কী করিব দাদু! পরাণ যে মানে না।
সেই ফালগুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
বা-জান, আমার শরীর আজিকে কী যে করে থাকি থাকি।
ঘরের মেঝেতে সপটি বিছায়ে কহিলাম বাছা শোও,
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কী জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে,
তুমি যে কহিলা বা-জানরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে?
তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে!

তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিতে সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতার সেই বেদনায় বুনো পথে যেতো ঝরে,
ফালগুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো-মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গৈয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাস্মা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়ে ডুবায় সকল গাঁ।

উদাসিনী সেই পল্লী-বালায় নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধারে ঘরে পথ পেয়েছিল খুজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, বাছারে যাই,



বড় ব্যথা র'ল, দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;
দুলাল আমার, যাদুরে আমার, লক্ষী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা ছাড়িয়া যাইতে তোরে।
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গন্ড ভিজিয়ে নয়নজলে,
কী জানি আশিস করে গেল তোরে মরণব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোর ডাকিয়া কহিল আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার মাথালখানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।
সেই যে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরাণের ব্যথা মরে নাকো সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরুছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায় পড়েছে গায়।
জোনকি মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বলাইয়া দেয় আলো,
ঝাঁঝিরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, রহমান খোদা! আয়;
ভেস্তু নসিব করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়!

এখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিঁ কাজিদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে।
এত আদরের বুজিরে তাহারা ভালবাসিত না মোটে,
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত, দাদু যেন কাল এসে
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে।
শ্বশুর তাহার কশাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনলাম এক শীতে।
সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটে না সেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হয়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণবীণ!
কী জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে,
এইখানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু! ধীরে।

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীকে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,



পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, আয় খোদা! দয়াময়।
আমার বুজীর তরেতে যেন গো ভেস্তু নসিব হয়।

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু, সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তুের দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারিয়ে কী জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুক লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা!
ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদির ছবিখানি মোর হৃদয়ে উঠিত ছেয়ে।
বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
রঙিন সাঁঝেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা।

একদিন গেনু গজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে।
কী জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গেছে।
আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি,
দাদু! ধরধর বুক ফেটে যায়, আর বুঝি নাহি পারি।
এইখানে এই কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু,
কথা কস নাকো, জাগিয়া উটিবে ঘুমভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে,

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিয়ে ঘন আবিরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায় পড়িত বড় সাধ আজ জাগে।
মজিদ হইতে আযান হাঁকিছে বড় সুকরণ সুরে,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূরে।
জোড়হাত দাদু মোনাজাত কর, আয় খোদা! রহমান।
ভেস্তু নসিব করিও সকল মৃত্যুব্যথিত প্রাণ।



জয় গোস্বামী

বৃষ্টি ভেজা বাংলা ভাষা



জন্ম : ১০ নভেম্বর ১৯৫৪

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস প্রজেক্ট
গুগল ভিডিও
জয় গোস্বামীর কবিতা

কে মেয়েটি হঠাৎ প্রণাম করতে এলে?
মাথার ওপর হাত রাখিনি
তোমার চেয়েও সসংকোচে এগিয়ে গেছি
তোমায় ফেলে
ময়লা চটি, ঘামের গন্ধ নোংরা গায়ে,
হলভরা লোক, সবাই দেখছে তার মধ্যেও
হাত রেখেছ আমার পায়ে

আজকে আমি বাড়ি ফিরেও স্নান করিনি
স্পর্শটুকু রাখব বলে
তোমার হাতের মুঠোয় ভরা পুস্করিণী
পরিবর্তে কী দেব আর? আমার শুধু
দু' চার পাতা লিখতে আসা

সর্বনাশের এপার ওপার দেখা যায় না
কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, রাঙা আলোয়
দাঁড়িয়ে আছে সে-ছন্দ, সে-কীর্তিনাশা।
অচেনা ওই মেয়ের চোখে যে পাঠাল
দু'-এক পলক বৃষ্টিভেজা বাংলা ভাষা।
অন্ধকারে সে শুনেছে চাপা ঝগড়া, দাঁত নখ,
ছিন্ন ভিন্ন মা আর বাবার।



জয় গোস্বামী

যে-ছাত্রীটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে

কী বুঝেছে সে-মেয়েটি?
সে বুঝেছে রাজুমামা মায়ের প্রেমিক।

কী শুনেছে সে-মেয়েটি?
সে শুনেছে মায়ের শীৎকার।

কী পেয়েছে সে-মেয়েটি? – সে পেয়েছে জন্মদিন?
চুড়িদার, আলুকাবলি – কু-ইঙ্গিত মামাতো দাদার।

সে খুঁজেছে ক্লাসনোট, সাজেশন –
সে ঠেলেছে বইয়ের পাহাড়

পরীক্ষা, পরীক্ষা সামনে – দিনে পড়া, রাতে পড়া –
ও পাশের ঘর অন্ধকার

অন্ধকারে সে শুনেছে চাপা ঝগড়া, দাঁত নখ,
ছিন্ন ভিন্ন মা আর বাবার।

হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে

অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে
হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে

করো আনন্দ আয়োজন করে পড়ো
লিপি চিত্রিত লিপি আঁকাবাঁকা পাহাড়ের সানুতলে
যে একা ঘুরছে, তাকে খুঁজে বার করো

করেছো, অতল; করেছিলে; পড়ে হাত থেকে লিপিখানি
ভেসে যাচ্ছিল—ভেসে তো যেতই, মনে না করিয়ে দিলে;
—'পড়ে রইল যে!' পড়েই থাকত—সে-লেখা তুলবে বলে

কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে।।



জীবনানন্দ দাশ

সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়

চোখ দুটো ঘুমে ভরে
ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে!
ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিল গোপন, – স্বপন ক’দিন রয়!
এসেছে গোধূলি গোলাপিবরন, – এ তবু গোধূলি নয়!
সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়,
আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের ‘পরে!

কেটেছে যে নিশি ঢের, –
এতদিন তবু অন্ধকারে পাইনি তো কোনো টের!
দিনের বেলায় যাদের দেখিনি – ধোঁয়ায় – ভিড়ের মাঝে,
শুনেছি স্বপনে তাদের কলসী ছলকে, – কাঁকন বাজে!
আকাশের নিচে – তারার আলোয় পেয়েছি যে তাহাদের!

চোখ দুটো ছিল জেগে
কত দিন যেন সন্ধ্যা – ভোরের নটকান্ – রাঙা মেঘে!
কত দিন আমি ফিরেছি একেলা মেঘলা গাঁয়ের ক্ষেতে!
ছায়াধূপে চুপে ফিরিয়াছি প্রজাপতিটির মতো মেতে
কত দিন হায়! – কবে অবেলায় এলোমেলো পথ যেতে
ঘোর ভেঙ্গে গেল, – খেয়ালের খেলাঘরটি গেল যে ভেঙ্গে!

দুটো চোখ ঘুমে ভরে
ঝরা ফসলের গান বুকে নিয়ে আজ ফিরে যাই ঘরে!
ফুরায়ে গিয়েছে যা ছিল গোপন, – স্বপন ক’দিন রয়!
এসেছে গোধূলী গোলাপিবরন, – এ তবু গোধূলি নয়!
সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়,
আমাদের মুখ সারাটি রাত্রি মাটির বুকের ‘পরে!

জন্ম : ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯

মৃত্যু : ২২ অক্টোবর ১৯৫৪

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
ফেসবুক ফ্যান পেইজ
ফেসবুক গ্রুপ
বসন্ত
ভার্চুয়াল বাংলাদেশ
ক্যালকাটা ওয়েব
ইউটিউবে জীবনানন্দ
ভিজউইকি



জীবনানন্দ দাশ

অন্ধকার

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার ;
তাকিয়ে দেখলাম পান্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে ।



ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম – পউষের রাতে –
কোনদিন আর জাগবো না জেনে
কোনদিন জাগবো না আমি – কোনোদিন জাগবো না আর –

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদয় নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে,
রয়েছে যে অগাধ ঘুম,
সে-আশ্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—
জানো না কি চাঁদ,
নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
জানো না কি নিশীথ,
আমি অনেক দিন – অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মুখ উচ্ছাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব ব'লে
বুঝতে পেরেছি আবার,
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় – বেদনায় – আক্রোশে ভরে গিয়েছে ;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কুটি কুটি শুয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে ।



হায়, উৎসব!

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি, অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর
মতো মিশে থাকতে চেয়েছি।

কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।

হে নর, হে নারী,

তোমাদের পৃথিবীকে চিনি নি কোনোদিন ;

আমি অন্য কোন নক্ষত্রের জীব নই।

যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গীত, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,

সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,

শত শত শুকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর ;

এইসব ভয়াবহ আরতী!

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আশ্বাদে আমার আত্মা লালিত ;

আমাকে জাগাতে চাও কেন?

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চহল চহল শব্দে জেগে উঠবো না আর ;

তাকিয়ে দেখবো না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে

অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে

কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো – ধীরে – পউষের রাতে

কোনোদিন জাগবো না জেনে—

কোনদিন জাগবো না আমি – কোনদিন আর।



জীবনানন্দ দাশ

হায় চিল!

হায় চিল, সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ল্লান চোখ মনে আসে।
পৃথিবীর রাঙ্গা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো?
কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদন জাগাতে ভালোবাসে!

হায় চিল , সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!

অদ্ভুত আঁধার এক

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই-প্রীতি নেই-করণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপারামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

সমারুঢ়

বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা -
বলিলাম ল্লান হেসে: ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর
বুঝিলাম সে তো কবি নয় - সে যে আরুঢ় ভণিতা
পান্ডুলিপি, ভাষ্য , টীকা , কালি আর কলমের ‘পর
ব’সে আছে সিংহাসনে - কবি নয় - অজর , অক্ষর
অধ্যাপক , দাঁত নেই - চোখ তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে - আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃ খুঁটি ;
যদিও সেসব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সৈঁক
চেয়েছিলো - হাঙরের ডেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।



জীবনানন্দ দাশ

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।



চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে-সব নদী-ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।



জীবনানন্দ দাশ

শ্যামলী

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন;
যখন জাহাজে চ'ড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে ব'লে,
মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার কথা ভুলে
সকালের রুঢ় রৌদ্রে ডুবে যেতো কোথায় অকূলে।

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব –
শ্যামলী, করেছি অনুভব।

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেলো;
মানুষকে স্থির – স্থিরতর হ'তে দেবে না সময়;
সে কিছু চেয়েছে ব'লে এতো রক্ত-নদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ; – শতাব্দীর তীরে এসে বারে;
কাল কিছু হয়েছিলো; – হবে কি শাস্বতকাল পরে।



জীবনানন্দ দাশ

পথ হাঁটা

কী এক ইশারা যেন মনে রেখে একা-একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হ'য়ে চ'লে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে :

সারারাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো ক'রে জ্বলে ।
কেউ ভুল করে নাকো – ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
চুপ হ'য়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে ।

একা-একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব;
তখন অনেক রাত – তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে; মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব

আর-কিছু দেখেছি কি : একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা?
চোখ নিচে নেমে যায় – চুরট নীরবে জ্বল – বাতাসে অনেক ধুলো খড়;
চোখ বুজে একপাশে স্থরে যাই – গাছ থেকে অনেক বাদামি জীর্ণ পাতা

উড়ে গেছে; বেবিলনে একা-একা এমনি হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজো আমি জানি নাকো হাজার-হাজার ব্যস্ত বছরের পর ।



জীবনানন্দ দাশ

আট বছর আগের একদিন

শোনা গেলো লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে - ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ।

বধূ শুয়ে ছিলো পাশে - শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো - জোৎস্নায়, - তবু সে দেখিল
কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল - লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি!
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের হুঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

কোনোদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম - অবিরাম ভার
সহিবে না আর -
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চলে গেলে - অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো প্যাঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায় - অনুমেয় উষ্ম অনুরাগে।

টের পাই যুথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;



মশা তার অন্ধকার সজ্জারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন - যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অধিকার করে আছে ইহাদের মন;
দূরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বথের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা - একা;
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের - মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বথের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি?
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা এসে
বলেনি কি : ‘বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে?
চমৎকার! -
ধরা যাক দু -একটা ইঁদুর এবার!’
জানায়নি প্যাঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

জীবনের এই স্বাদ - সুপক্ক যবের ভ্রাণ হেমন্তের বিকেলের -
তোমার অসহ্য বোধ হলো;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে - গুমোটো
থ্যাতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে!

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প; - কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখে নি কোন খাদ,
সময়ের উর্ধ্বতনে উঠে এসে বধূ



মধু - আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের ‘পরে’।

জানি - তবু জানি
নারীর হৃদয় - প্রেম - শিশু - সূহ - নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয় -
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে;
ক্লান্ত - ক্লান্ত করে;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের ‘পরে’।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বথের ডালে বসে এসে,
চোখ পালটায়ে কয় : ‘বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা হুঁদুর এবার -’

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজও চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হব - বুড়ি চাঁদটারে আমি করে দেব
কালীদহে বেনো জলে পার;
আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।



জীবনানন্দ দাশ

ঘোড়া

আমরা যাইনি ম'রে আজো - তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়,
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ;
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন - এখনো ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে ।

আস্তাবলের দ্রাণ ভেসে আসে একভিড় রাত্রির হাওয়ায় ;
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে ;
চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো
ঘুমে
ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে

হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস্-রেস্তুরাতে,
প্যারাক্সিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;

এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তম্ভতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে ।

বুনো হাঁস

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আস্থানে
বুনো হাঁস পাখা মেলে - সাঁই-সাঁই শব্দ শুনি তার;
এক - দুই - তিন - চার - অজস্র - অপার -

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে; ছুটিতেছে - ছুটিতেছে তা'রা ।
তারপর প'ড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের দ্রাণ - দু-একটা কল্লনার হাঁস;

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরণিমা সান্যালের মুখ;
উডুক-উডুক তা'রা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উডুক
কল্লনার হাঁস সব; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উডুক উডুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর ।



জীবনানন্দ দাশ

অবসরের গান



শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গৈয়ের মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার – চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আশ্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয় –
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট করে দেবে তার সাধের সময়!
চারি দিকে এখন সকাল –
রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মতো লাল!
মাঠের ঘাসের পরে শৈশবের ঘ্রাণ –
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের পড়েছে আহ্বান!

চারি দিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল!
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!
শরীর এলায়ে আসে এই খানে ফলন্ত ধানের মতো করে
যেই রোদ একবার এসে শুধু চলে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে
আহ্লাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর,
চারি দিকে ছায়া – রোদ – ক্ষুদ – কুঁড়া – কার্তিকের ভিড়:
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এই খানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপাশালি ধান ভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ!
আমি সেই সুন্দরীয়ে দেখে লই – নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়েবার দেরি না – রূপ ঝরে পড়ে তার –
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে!

আজও তবুও ফুরায় নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে মাঠে ঝ'রে পড়ে কাঁচা রোদ, ভাড়ারের রস!

মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয়
সকালবেলা রৌদ্রে; কুঁড়িমির আজিকে সময়।

গাছের ছায়ার তলে মদ লয়ে কোন ভাঁড় বেঁধেছিল ছড়া!
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া;
ভুলে গিয়ে রাজ্য – জয় – সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে লব তার শীতলতা;



ডেকে লব আইবুড় পাড়াগাঁর মেয়েদের সব —
মাঠের নিস্তেজ রোদের নাচ হবে —
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব ।

হাতে হাত ধরে ধরে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
কার্তিকের মিঠা রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে;
ফলন্ত ধানের গন্ধে — রঙে তার — স্বাদে তার ভরে যাবে আমাদের সকলের দেহ;
রাগ কেহ করিবে না — আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ ।
আমাদের অবসর বেশি নয় — ভালোবাসা আল্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয়
দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ছাণ — অবসাদ —
আমাদের ডেকে লয় — তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা — অবসন্ন হাত ।

তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে ক্ষেতে — রোদ গেছে পড়ে,
এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধরে;
তখন গিয়েছে থেমে এই কুঁড়ে গাঁয়েদের মাঠের রগড়
হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ বরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালির
বিছানার পর;
মদের ফোঁটার শেষ হয়ে গেছে এ মাঠের মাটির ভিতর!
তখন সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা সব, হয়ে গেছে আকাশ ধবল,
চলে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েদের দল!

২
পুরনো পেঁচার সব কোটারের থেকে
এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের পরে
সবুজ ধানের নিচে — মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চলে গেছে — আঁটির ভিতর থেকে চলে গেছে চাষা;
শস্যের ক্ষেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা!

ফলন্ত মঠের' পরে আমরা খুঁজি না আজ মরণের স্থান,
প্রেম আর পিপাসার গান
আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন!
ফসল — ধানের ফলে যাহাদের মন
ভরে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা করে গেছে —
পৃথিবীর সব সিংহাসন —
আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড় —
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নীচে পৃথিবীর তলে
কোটালের মতো তারা নিশ্বাসের জলে
ফুরায় নি তাদের সময়;
পৃথিবীর পুরোহিতদের মতো তারা করে নাই ভয়!



প্রণয়ীর মতো তারা ছেড়ে নি হৃদয়
ছড়া বেঁধে শহরের মেয়েদের নামে!
চাষাদের মতো তারা ক্লান্ত হয়ে কপালের ঘামে
কাটায় নি - কাটায় কি কাল।
অনেক মাটির নিচে তাদের কপাল
কোনো এক সম্রাটের সাথে
মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে!
যোদ্ধা - জয়ী - বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে -
পাশাপাশি -
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি!

অনেক রাতের আগে এসে তারা চলে গেছে - তাদের দিনের আলো
হয়েছে আঁধার,
সেই সব গেলো কবি - পাড়াগাঁর ভাঁড়
আজ এই অন্ধকারে আসিবে কি আর?
তাদের ফলন্ত দেহ শুষে ল'য়ে জন্মিয়াছে আজ এই খেতের ফসল;
অনেক দিনের গন্ধে ভরা ঐ ইদুরের জানে তাহা - জানে তাহ
নরম রাতের হাতে বরা এই শিশিরের জল!
সে সব পেঁচারা আজ বিকালের নিশ্চলতা দেখে
তাহাদের নাম ধরে যায় ডেকে ডেকে।
মাটির নিচের থেকে তারা
মৃতের মাথার স্বপ্নে নড়ে উঠে জানায় কী অদ্ভুত ইশারা!

আঁধারের মশা আর নক্ষত্র তা জানে -
আমরাও আসিয়াছি ফসলের মাঠের আহ্বানে।
সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে, পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে
শহর - বন্দর - বস্তি - কারখানা দেশলাইয়ে জ্বলে
আসিয়াছি নেমে এই ক্ষেতে;
শরীরের অবসাদ - হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।

শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভিজা পথ ধরে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই মরে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন;
অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেলো কবি - পাড়াগার ভাঁড়ের মতন!

জমি উপড়িয়ে ফেলে চলে গেছে চাষা
নতুন লাঙল তার পড়ে আছে - পুরনো পিপাসা
জেগে আছে মাঠের উপরে;
সময় হাঁকিয়া যায় পেঁচা অই আমাদের তরে!
হেমন্তের ধান ওঠে ফলে -



দুই পা ছড়ায়ে বস এইখানে পৃথিবীর কোলে ।
আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চলে চাঁদ
অবসর আছে তার - অবোধের মতন আহ্বাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চলে যাবে পশ্চিমের পানে —
এটুকু সময় তাই কেটে যাক রূপ আর কামনার গানে!

৩

ফুরোনো ক্ষেতের গন্ধে এইখানে ভরেছে ভাঁড়ার;
পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নাই - কোনো কৃষকের মতো দরকার নাই
দূরে মাঠে গিয়ে আর!
রোধ - অবরোধ - ক্লেশ - কোলাহল শনিবার নাহিকো সময় —
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোনখানে
কোথায় নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়!
আমার চোখের পাশে আনিয়ো না সৈন্যদের মশালের আগুনের রঙ
দামামা থামায়ে ফেল - পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক
রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ!

এখানে নাহিকো কাজ — উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা ।
অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষন্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়!
সকল পড়ন্ত রোদ চারি দিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন —
জেগে থেকে ঘুমবার সাধ ভালোবেসে ।

এখানে চকিত হতে হবে নাকো - ত্রস্ত হয়ে পড়িবার নাহিকো সময়;
উদ্যমের ব্যথা নাই - এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়!
এই খানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে!
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর —
রাখিবে না চোখ আর নয়নের পর;
ভালোবাসা আসিবে না —
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর!

অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষন্ন সময়
পৃথিবীর মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়;
সকল পড়ন্ত রোদ চারি দিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমাবার
সাধ ভালোবেসে!



তারা পদ রায়

দিন আনি, দিন খাই

আমরা যারা দিন আনি, দিন খাই,
আমরা যারা হাজার হাজার দিন খেয়ে ফেলেছি,
বৃষ্টির দিন, মেঘলা দিন, কুয়াশা ঘেরা দিন,
স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অধীর প্রতীক্ষারত দিন,
অপमानে মাথা নিচু করে চোরের মতো চলে যাওয়া দিন,
খালি পেট, ছেঁড়া চটি, ঘামে ভেজা দিন,
নীল পাহাড়ের ওপারে, সবুজ বনের মাথায় দিন,
হৈ হৈ অট্টহাসিতে কলরোল কোলাহল ভরা দিন,
হঠাৎ দক্ষিণের খোলা বারান্দায় আলো ঝলমলে দিন-
এই সব দিন আমরা কেমন করে এনেছিলাম, কিভাবে,
কেউ যদি হঠাৎ জানতে চায়, এ রকম একটা প্রশ্ন করে,

আমরা যারা কিছুতেই সদুত্তর দিতে পারবো না,
কিছুই বলতে পারবো না, কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবো না
কি করে আমরা দিন এনেছিলাম,
কেন আমরা দিন আনি, কেন আমরা দিন খাই,
কেমন করে আমরা দিন আনি, দিন খাই।

জন্ম : ১৭ নভেম্বর ১৯৩৬

মৃত্যু : ২৫ আগস্ট ২০০৭

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
ক্যালকাটা ওয়েব
ওপেন লাইব্রেরি

এক জন্ম

অনেকদিন দেখা হবে না
তারপর একদিন দেখা হবে।
দু'জনেই দু'জনকে বলবো,
'অনেকদিন দেখা হয়নি'।
এইভাবে যাবে দিনের পর দিন
বৎসরের পর বৎসর।
তারপর একদিন হয়ত জানা যাবে
বা হয়ত জানা যাবে না,
যে
তোমার সঙ্গে আমার
অথবা
আমার সঙ্গে তোমার
আর দেখা হবে না।



নাজিম হিকমত

জেলখানার চিঠি

১
প্রিয়তমা আমার
তোমার শেষ চিঠিতে
তুমি লিখেছ;
‘মাথা আমার ব্যথায় টন্ টন্ করছে
দিশেহারা আমার হৃদয়।’

তুমি লিখেছ;
‘যদি ওরা তোমাকে ফাঁসি দেয়
তোমাকে যদি হারাই
আমি বাঁচব না।’

তুমি বেঁচে থাকবে প্রিয়তমা বধু আমার
আমার স্মৃতি কালো ধোঁয়ার মত হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে
তুমি বেঁচে থাকবে, আমার হৃদয়ের রক্তকেশী ভগিনী,
বিংশ শতাব্দীতে
মানুষের শোকের আয়ু
বড় জোর এক বছর।

মৃত্যু...
দড়ির এক প্রান্তে দোদুল্যমান শবদেহ
আমার কাম্য নয় সেই মৃত্যু।
কিন্তু প্রিয়তমা আমার, তুমি জেনো
জল্লাদের লোমশ হাত
যদি আমার গলায়
ফাঁসির দড়ি পরায়
নাজিমের নীল চোখে
ওরা বৃথাই খুঁজে ফিরবে ভয়।

জন্ম : ১৫ জানুয়ারি ১৯০২
মৃত্যু : ২ জুন ১৯৬৩

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
কবিতা সমগ্র
পয়েম হান্টার
পয়েটস ডট অর্গ



অন্তিম উষার অস্ফুট আলোয়
আমি দেখব আমার বন্ধুদের, তোমাকে দেখব
আমার সঙ্গে কবরে যাবে
শুধু আমার
এক অসমাপ্ত গানের বেদনা।

২
বধু আমার
তুমি আমার কোমলপ্রাণ মৌমাছি
চোখ তোমার মধুর চেয়েও মিষ্টি।
কেন তোমাকে আমি লিখতে গেলাম
ওরা আমাকে ফাঁসি দিতে চায়
বিচার সবে মাত্র শুরু হয়েছে
আর মানুষের মুণ্ডুটা তো বোঁটার ফুল নয়
যে ইচ্ছে করলেই ছিঁড়ে নেবে।

কবি পরিচিতি

নাজিম হিকমত শুধু তুরকের এ
শতাব্দীর সব থেকে প্রিয় কবিই
নন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে
একজন। বামপন্থীদের দলভুক্ত
হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে
আন্দোলন-সংগ্রামের কারণে
তাকে ২০ বছর সাজা ভোগ
করতে হয়। সরকারের বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করার অপরাধে তাকে
মোট ৫৬ বছরের সাজা দেওয়া
হয়, যা তার নিজের বয়সের
চয়েও বেশি। জন্ম ১৯০২ সাল।
মাত্র ১৪ বছর বয়সে সাহিত্যে
হাতে খড়ি।

এই কবিতাটি মূল তুর্কী থেকে
ইংরেজিতে, পরে ইংরেজি থেকে
বাংলায় অনুবাদ করেন সুভাষ
মুখোপাধ্যায়।

ভুলে যেও না
স্বামী যার জেলখানায়
তার মনে যেন সব সময় ফুটি থাকে

বাতাস আসে, বাতাস যায়
চেরির একই ডাল একই ঝড়ে
দুবার দোলে না।

গাছে গাছে পাখির কাকলি
পাখাগুলো উড়তে চায়।
জানলা বন্ধ,
টান মেরে খুলতে হবে।

আমি তোমাকে চাই, তোমার মত রমণীয় হোক জীবন
আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তমার মতন।

আমি জানি, দুঃখের ডালি
আজও উজাড় হয়নি
কিন্তু একদিন হবে।



৩

নতজানু হয়ে আমি চেয়ে আছি মাটির দিকে
উজ্জল নীল ফুলের মঞ্জরিত শাখার দিকে আমি তাকিয়ে
তুমি যেন মৃন্ময়ী বসন্ত, আমার প্রিয়তমা
আমি তোমার দিকে তাকিয়ে ।

মাটিতে পিঠ রেখে আমি দেখি আকাশকে
তুমি মধুমাস, তুমি আকাশ
আমি তোমাকে দেখছি প্রিয়তমা ।

রাত্রির অন্ধকারে, গ্রামদেশে শুকনো পাতায় আমি জ্বালিয়েছিলাম আগুন
আমি স্পর্শ করছি সেই আগুন
নক্ষত্রের নিচে জ্বালা অগ্নিকুণ্ডের মত তুমি
আমার প্রিয়তমা, আমি তোমাকে স্পর্শ করছি ।

আমি আছি মানুষের মাঝখানে, ভালবাসি মানুষকে
ভালবাসি আন্দোলন,
ভালবাসি চিন্তা করতে,
আমার সংগ্রামকে আমি ভালবাসি
আমার সংগ্রামের অন্তঃস্থলে মানুষের আসনে তুমি আসীন
প্রিয়তমা আমার, আমি তোমাকে ভালবাসি ।

৪

রাত এখন ন'টা
ঘন্টা বেজে গেছে গুমটিতে
সেলের দরোজা তালা বন্ধ হবে এক্ষুনি ।

বেঁচে থাকায় অনেক আশা, প্রিয়তমা
তোমাকে ভালবাসার মতই একাত্ত বেঁচে থাকা ।
কী মধুর, কী আশায় রঙিন তোমার স্মৃতি...
কিন্তু আর আমি আশায় তুষ্ট নই,
আমি আর শুনতে চাই না গান ।
এবার আমার নিজের গান আমি গাইব ।



আমাদের ছেলেটা বিছানায় শয্যাগত
বাপ তার জেলখানায়
তোমার ভারাক্রান্ত মাথাটা ক্লান্ত হাতের ওপর এলানো
দুঃসময় থেকে সুসময়ে
মানুষ পৌঁছে দেবে মানুষকে
আমাদের ছেলেটা নিরাময় হয়ে উঠবে
তার বাপ খালাস পাবে জেল থেকে
তোমার সোনালী চোখে উপচে পড়বে হাসি
আমার আর আমাদের এই পৃথিবী একই সূচাগ্রে দাঁড়িয়ে !

৫
যে সমুদ্র সব থেকে সুন্দর
তা আজও আমরা দেখিনি।
সব থেকে সুন্দর শিশু
আজও বেড়ে ওঠে নি
আমাদের সব থেকে সুন্দর দিনগুলো
আজও আমরা পাইনি।
মধুরতম যেকথা আমি বলতে চাই।
সে কথা আজও আমি বলিনি।

৬
কাল রাতে তোমাকে আমি স্বপ্ন দেখলাম
মাথা উঁচু করে
ধূসর চোখে তুমি চেয়ে আছো আমার দিকে
তোমার আদ্র ওষ্ঠাধর কম্পমান
কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না।

কৃষ্ণপক্ষ রাতে কোথাও আনন্দ সংবাদের
মত ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ
বাতাসে গুন্ গুন্ করছে মহাকাল
আমার ক্যানারির লাল খাঁচায়
গানের একটি কলি,
লাঙ্গল-চষা ভুঁইতে
মাটির বুক ফুঁড়ে উদগত অঙ্কুরের দুরন্ত কলরব



আর এক মহিমাম্বিত জনতার বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত ন্যায্য অধিকার
তোমার আদ্র ওষ্ঠাধর কম্পমান
কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না।

আশাভঙ্গে অভিশাপ নিয়ে জেগে উঠলাম।
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বইতে মুখ রেখে।
অতগুলো কণ্ঠস্বরের মধ্যে
তোমার স্বরও কি আমি শুনতে পাই নি?

৭
আমি জেলে আসবার সময়
যে সন্তানেরা জননীর গর্ভে ছিল
আজ তারা দশ বছরের বালক।
আমি জেলে যাবার পর
আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল হয়েছে দিন।
আর অন্ধকারের কিনার থেকে ফুটপাতে
তাদের ভারী হাতে ভর দিয়ে তারা অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়েছে
আমি জেলে যাবার পর
সূর্যকে দশবার প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী।

আর আমি বারংবার সেই একই কথা বলছি
জেলখানায় কাটানো দশটা বছর যা লিখেছি
সব তাদেরই জন্যে, তাদেরই জন্যে
যারা যারা মাটির পিঁপড়ের মত,
সমুদ্রের মাছের মত, আকাশের পাখির মত অগণিত।
যারা ভীষণ, যারা বীর, যারা নিরক্ষর
যারা শিক্ষিত, যারা শিশুর মত সরল
যারা ধ্বংস করে, যারা সৃষ্টি করে...

কেবল, কেবল তাদেরই জীবন বৃত্তান্ত মুখর আমার গানে।
আর যা কিছু; ধরো আমার জেলের দশটা বছর,
শুধুমাত্র, শুধুমাত্র কথার কথা।



নির্মলেন্দু গুণ

মানুষ

আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষগুলো অন্যরকম,
হাঁটতে পারে, বসতে পারে, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যায়,
মানুষগুলো অন্যরকম, সাপে কাটলে দৌড়ে পালায় ।

আমি হয়তো মানুষ নই, সারাটা দিন দাঁড়িয়ে থাকি,
গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকি ।
সাপে কাটলে টের পাই না, সিনেমা দেখে গান গাই না,
অনেকদিন বরফমাখা জল খাই না ।
কী করে তভও বেঁচে থাকছি, ছবি আঁকছি,
সকালবেলা, দুপুরবেলা অবাক করে
সারাটা দিন বেঁচেই আছি আমার মতে । অবাক লাগে ।

আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষ হলে জুতো থাকতো,
বাড়ি থাকতো, ঘর থাকতো,
রাত্রিবেলায় ঘরের মধ্যে নারী থাকতো,
পেটের পটে আমার কালো শিশু আঁকতো ।

আমি হয়তো মানুষ নই,
মানুষ হলে আকাশ দেখে হাসবো কেন?
মানুষগুলো অন্যরকম, হাত থাকবে,
নাক থাকবে, তোমার মতো চোখ থাকবে,
নিকেলমাখা কী সুন্দর চোখ থাকবে
ভালোবাসার কথা দিলেই কথা রাখবে ।
মানুষ হলে উরুর মধ্যে দাগ থাকতো ,
বাবা থাকতো, বোন থাকতো,
ভালোবাসার লোক থাকতো,
হঠাৎ করে মরে যাবার ভয় থাকতো ।

আমি হয়তো মানুষ নই,
মানুষ হলে তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখা
আর হতো না, তোমাকে ছাড়া সারাটা রাত
বেঁচে থাকাটা আর হতো না ।

মানুষগুলো সাপে কাটলে দৌড়ে পালায় ;
অথচ আমি সাপ দেখলে এগিয়ে যাই,
অবহেলায় মানুষ ভেবে জাপটে ধরি ।



জন্ম : ২১ জুন ১৯৪৫

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
ফেসবুক পেইজ
লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস প্রজেক্ট
স্বকণ্ঠে স্বরচিত কবিতা
আবৃত্তি - মানুষ
বসন্ত ১
বসন্ত ২



নির্মলেন্দু গুণ

সেই রাত্রির কল্পকাহিনী

তোমার ছেলেরা মরে গেছে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে,
তারপর গেছে তোমার পুত্রবধূদের হাতের মেহেদী রঙ,
তারপর তোমার জন্মসহোদর, ভাই শেখ নাসের,
তারপর গেছেন তোমার প্রিয়তমা বাল্যবিবাহিতা পত্নী,
আমাদের নির্ধাতিতা মা।



এরই ফাঁকে একসময় ঝরে গেছে তোমার বাড়ির
সেই গরবিনী কাজের মেয়েটি, বকুল।
এরই ফাঁকে একসময় প্রতিবাদে দেয়াল থেকে
খসে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের দরবেশ মার্কী ছবি।
এরই ফাঁকে একসময় সংবিধানের পাতা থেকে
মুছে গেছে দু'টি স্তম্ভ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।
এরই ফাঁকে একসময় তোমার গৃহের প্রহরীদের মধ্যে
মরেছে দু'জন প্রতিবাদী, কর্ণেল জামিল ও নাম না-জানা
এক তরুণ, যারা জীবনের বিনিময়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলো।

তুমি কামান আর মৃত্যুর গর্জনে উঠে বসেছো বিছানায়,
তোমার সেই কালো ফ্রেমের চশমা পরেছো চোখে,
লুপ্তির উপর সাদা ফিনফিনে ৭ই মার্চের পাঞ্জাবী,
মুখে কালো পাইপ, তারপর হেঁটে গেছো বিভিন্ন কোঠায়।
সারি সারি মৃতদেহগুলি তোমার কি তখন খুব অচেনা ঠেকেছিলো?
তোমার রাসেল? তোমার প্রিয়তম পত্নীর সেই গুলিবিদ্ধ গ্রীবা?
তোমার মেহেদীমাখা পুত্রবধূদের মুজিবান্ধিত করতল?
রবীন্দ্রনাথের ভুলুঠিত ছবি?
তোমার সোনার বাংলা?

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে তুমি শেষবারের মতো
পাপস্পর্শহীন সংবিধানের পাতা উন্টিয়েছো,
বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে
মেখেছো কপালে, ঐ তো তোমার কপালে আমাদের হয়ে



পৃথিবীর দেয়া মাটির ফোঁটার শেষ-তিলক, হায়!
তোমার পা একবারও টলে উঠলো না, চোখ কাঁপলো না।
তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির অপচয়
বন্ধ করতে, কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশি।
কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য একজন
শ্রমিকের এক বেলার সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশি।
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন, শুধু তোমার জীবন, পিতা।

তুমি হাত উঁচু করে দাঁড়ালে, বুক প্রসারিত করে কী আশ্চর্য
আহবান জানালে আমাদের। আর আমরা তখন?
আমরা তখন রঙিন মাফিক ট্রিগার টিপলাম।
তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হাজার হাজার পাখির ঝাঁক
পাখা মেলে উড়ে গেলো বেহেশতের দিকে...।
... তারপর ডেডস্টপ।

তোমার নিঃপ্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে, গড়াতে, গড়াতে
আমাদের পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে থামলো।
কিন্তু তোমার রক্তস্রোত থামলো না।
সিঁড়ি ডিঙিয়ে, বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত,
সেই লাল টকটকে রক্ত বাংলার দূর্বা ছোঁয়ার আগেই
আমাদের কর্ণেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন।



নির্মলেন্দু গুণ

হুলিয়া

আমি যখন বাড়িতে পৌঁছলুম তখন দুপুর,
চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ্দুর - ;
আমার শরীরের ছায়া ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন
একটি রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।



কেউ চিনতে পারেনি আমাকে,
ট্রেনে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে একজনের কাছ থেকে
আগুন চেয়ে নিয়েছিলুম, একজন মহকুমা স্টেশনে উঠেই
আমাকে জাপটে ধরতে চেয়েছিল,
একজন পেছন থেকে কাঁধে হাত রেখে চিৎকার করে উঠেছিল।
আমি সবাইকে মানুষের সমিল চেহারার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।

কেউ চিনতে পারেনি আমাকে, একজন রাজনৈতিক নেতা
তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন, মুখোমুখি বসে দূর থেকে
বারবার চেয়ে দেখলেন, কিন্তু চিনতে পারলেন না।

বারহাট্টায় নেমেই রফিজের স্টলে চা খেয়েছি,
অথচ কি আশ্চর্য, পুনর্বীর চিনি দিতে এসেও
রফিজ আমাকে চিনলো না।
দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পরিবর্তনহীন গ্রামে ফিরছি আমি।
সেই একই ভাঙা পথ,
একই কালোমাটির আল ধরে গ্রামে ফেরা,
আমি কতদিন পর গ্রামে ফিরছি।

আমি যখন গ্রামে পৌঁছলুম তখন দুপুর,
আমার চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ,
শৌ শৌ করছে হাওয়া।
অনেক বদলে গেছে বাড়িটা,
টিনের চাল থেকে শুরু করে পুকুরের জল,
ফুলের বাগান থেকে শুরু করে গরুর গোয়াল;
চিহ্নমাত্র শৈশবের স্মৃতি যেন নেই কোনোখানে।



পড়ার ঘরের বারান্দায় নুয়ে পড়া বেলিফুলের গাছ থেকে
একটি লাউডুগী উত্তপ্ত দুপুরকে তার লকলকে জিভ দেখালো।
স্বতঃস্ফূর্ত মুখের দাড়ির মতো বাড়িটির চতুর্দিকে
ঘাস, জঙ্গল, গর্ত, আগাছার গাঢ় বন গড়ে উঠেছে অনায়াসে;
যেন সবখানেই সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে
এখানে শাসন করছে গৌয়ার প্রকৃতি।
একটি শেয়াল একটি কুকুরের পাশে শুয়েছিল প্রায়,
আমাকে দেখেই পালালো একজন,
একজন গন্ধ ঝুঁকে নিয়ে আমাকে চিনতে চেষ্টা করলো
যেমন পুলিশ-সমেত চেকার তেজগাঁয়
আমাকে চিনতে চেষ্টা করেছিল।

হাঁটতে হাঁটতে একটি গাছ দেখে থমকে দাঁড়ালাম,
অশোক গাছ, বাষট্টির ঝড়ে ভেঙে যাওয়া অশোক,
একসময় কী ভীষণ ছায়া দিতো এই গাছটা;
অনায়াসে দু'জন মানুষ মিশে থাকতে পারতো এর ছায়ায়।
আমরা ভালোবাসার নামে একদিন সারারাত
এ গাছের ছায়ায় লুকিয়েছিলুম।
সেই বাসন্তী, আহা, সেই বাসন্তী এখন বিহারে,
ডাকাত স্বামীর ঘরে চার সন্তানের জননী হয়েছে।

পুকুরের জলে শব্দ উঠলো মাছের, আবার জিভ দেখালো সাপ,
শান্ত-স্থির-বোকা গ্রামকে কাঁপিয়ে দিয়ে
একটি প্লেন তখন উড়ে গেলো পশ্চিমে...।
আমি বাড়ির পেছন থেকে শব্দ করে
দরোজায় টোকা দিয়ে ডাকলুম, 'মা'?
বহুদিন যে দরোজা খোলেনি,
বহুদিন যে দরোজায় কোন কণ্ঠস্বর ছিল না,
মরচে পরা সেই দরোজা মুহূর্তেই ক্যাচক্যাচ শব্দ করে খুলে গেলো।
বহুদিন চেষ্টা করেও যে গোয়েন্দা বিভাগ আমাকে ধরতে পারেনি,
চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরে, অফুরন্ত হাওয়ার ভিতরে সেই আমি
কত সহজেই একটি আলিঙ্গনের কাছে বন্দী হয়ে গেলুম;
সেই আমি কত সহজেই মায়ের চোখে চোখ রেখে
একটি অবুঝ সন্তান হয়ে গেলুম।



মা আমাকে ক্রন্দনসিক্ত একটি চুম্বনের মধ্যে
লুকিয়ে রেখে, অনেক জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে
পুকুরের জলে চাল ধুতে গেলেন।
আমি ঘরের ভিতরে তাকালুম,
দেখলুম দু'ঘরের মাঝামাঝি যেখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি ছিল,
সেখানে লেনিন, বাবার জমা খরচের পাশে কার্ল মার্কস;
আলমিরার একটি ভাঙ্গা কাচের অভাব পূরণ করছে
ক্লপস্কায়ার ছেঁড়া ছবি।

মা পুকুর থেকে ফিরছেন, সন্ধ্যায় মহকুমা শহর থেকে
ফিরবেন বাবা, তাঁর পিঠে সংসারের ব্যাগ ঝুলবে তেমনি।
সেনবাড়ি থেকে খবর পেয়ে বৌদি আসবেন,
পুনর্বীর বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন আমাকে।
খবর পেয়ে যশমাধব থেকে আসবে ন্যাপকর্মী ইয়াসিন,
তিন মাইল বিষ্টির পথ হেঁটে রসুলপুর থেকে আসবে আদিত্য।
রাত্রে মারাত্মক অস্ত্র হাতে নিয়ে আমতলা থেকে আসবে আব্বাস।
ওরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করবে ঢাকার খবর:
'আমাদের ভবিষ্যত কী?'
'আইয়ুব খান এখন কোথায়?'
'শেখ মুজিব কি ভুল করেছেন?'
'আমার নামে কতদিন আর এরকম হুলিয়া ঝুলবে?

আমি কিছুই বলবো না।
আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকা সারি সারি চোখের ভিতরে
বাংলার বিভিন্ন ভবিষ্যৎকে চেয়ে চেয়ে দেখবো।
উৎকণ্ঠিত চোখে চোখে নামবে কালো অন্ধকার, আমি চিৎকার করে
কণ্ঠ থেকে অক্ষম বাসনার জ্বালা মুছে নিয়ে বলবো:
'আমি এ-সবের কিছুই জানি না,
আমি এ-সবের কিছুই বুঝি না।'

কাব্যগ্রন্থ : প্রেমাংশুর রক্ত চাই
রচনাকাল : ১৯৭০



নির্মলেন্দু গুণ

স্বাধীনতা, উলঙ্গ কিশোর

জননীর নাভিমূল ছিঁড়ে উলঙ্গ শিশুর মত
বেরিয়ে এসেছো পথে, স্বাধীনতা, তুমি দীর্ঘজীবী হও।

তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি পাক আমার অস্তিত্বে, স্বপ্নে,
প্রাত্যহিক বাহুর পেশীতে, জীবনের রাজপথে,
মিছিলে মিছিলে; তুমি বেঁচে থাকো, তুমি দীর্ঘজীবী হও।

তোমার হা-করা মুখে প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে
সূর্যাস্ত অবধি হরতাল ছিল একদিন,
ছিল ধর্মঘট, ছিল কারখানার ধুলো।
তুমি বেঁচেছিলে মানুষের কলকোলাহলে,
জননীর নাভিমূলে ক্ষতচিহ্ন রেখে
যে তুমি উলঙ্গ শিশু রাজপথে বেরিয়ে এসেছো,
সে-ই তুমি আর কতদিন ‘স্বাধীনতা, স্বাধীনতা’ বলে
ঘুরবে উলঙ্গ হয়ে পথে পথে সম্রাটের মতো?

জননীর নাভিমূল থেকে ক্ষতচিহ্ন মুছে দিয়ে
উদ্ধত হাতের মুঠোয় নেচে ওঠা, বেঁচে থাকা
হে আমার দৃংখ, স্বাধীনতা, তুমিও পোশাক পরো;
ক্ষান্ত করো উলঙ্গ ভ্রমণ, নয়তো আমারো শরীর থেকে
ছিঁড়ে ফেলো স্বাধীনতা নামের পতাকা।

বলো উলঙ্গতা স্বাধীনতা নয়,
বলো দৃংখ কোনো স্বাধীনতা নয়,
বলো ক্ষুধা কোন স্বাধীনতা নয়,
বলো ঘৃণা কোন স্বাধীনতা নয়।

জননীর নাভিমূল ছিন্ন-করা রক্তজ কিশোর তুমি
স্বাধীনতা, তুমি দীর্ঘজীবী হও। তুমি বেঁচে থাকো
আমার অস্তিত্বে, স্বপ্নে, প্রেমে, বল পেন্সিলের
যথেষ্ট অক্ষরে,
শব্দে,
যৌবনে,
কবিতায়।



নির্মলেন্দু গুণ

উল্টোরথ

শুধু চোখে নয়, হাত দিয়ে হাত,
মুখ দিয়ে মুখ, বুক দিয়ে বুক ;
ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট খোলো, এইভাবে
খুলে খুলে তোমাকে দেখাও ।
শুধু চোখে নয়, নখ দিয়ে নখ,
চুল দিয়ে চুল, আঙুলে আঙুল;
হাঁটু দিয়ে হাঁটু, উরু দিয়ে উরু,
আর এটা দিয়ে ওটাকে ঠেকাও ।

শুধু চোখে নয়, চোখে চোখে চোখ,
বাহু দিয়ে বাহু, নাভি দিয়ে নাভি;
চাবি দিয়ে তালা খোলা দেখিয়াছি,
তালা দিয়ে খোলো দেখি চাবি?

খেলাঘর

শিশুরা খেলাঘর করে ।
তারা হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন নিয়ে
বড়দের মতো সংসার সংসার খেলে ।
তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে
ঘুমভাঙ্গার পর শুরু হয় তাদের অন্য খেলা ।
এক্কা-দোক্কা, গোল্লাছুট কিংবা
কানামাছি ভৌ ভৌ!

বড়োরাও খেলাঘর করে ।
তাদের বাসন-কোসনগুলো আকৃতিতে বড়ো,
তাদের কামনা বাসনার মতো ।
তারা তাদের খেলাঘরের নাম রাখে সংসার ।
শিশুদের মতো তারাও ক্লান্ত হয় ,
তারাও সংসার ভাঙ্গে, কিন্তু শিশুদের মতো
তারা ঘুমুতে পারে না ।

আসমানী প্রেম

নেই তবু যা আছে মতো দেখায়
আমরা তাকে আকাশ বলে ডাকি,
সেই আকাশে যাহারা নাম লেখায়
তাদের ভাগ্যে অনিবার্য ফাঁকি!

জেনেও ভালোবেসেছিলাম তারে ,
ধৈর্য ধরে বিরহ ভার স্ববো ;
দিনের আলোয় দেখাবো নিঃপ্রভ
জ্বলবো বলে রাতের অন্ধকারে ।

আমায় তুমি যতোই ঠেলো দূরে
মহাকাশের নিয়ম কোথায় যাবে?
আমি ফিরে আসবো ঘুরে ঘুরে
এহ হলে উপগ্রহে পাবে!

মাটি হলে পাবে শস্য-বীজে
বাতাস হলে পাবে আমায় বাড়ে!
মৃত্যু হলে বুঝবে আমি কি যে ,
ছিলেম তোমার সারাজীবন ধরে!



নির্মলেন্দু গুণ

তোমার চোখ এতো লাল কেন

আমি বলছি না ভালোবাসতেই হবে, আমি চাই
কেউ একজন আমার জন্য অপেক্ষা করুক,
শুধু ঘরের ভেতর থেকে দরোজা খুলে দেবার জন্য।
বাইরে থেকে দরোজা খুলতে খুলতে আমি এখন ক্লান্ত।



আমি বলছি না ভালোবাসতেই হবে, আমি চাই
কেউ আমাকে খেতে দিক। আমি হাতপাখা নিয়ে
কাউকে আমার পাশে বসে থাকতে বলছি না,
আমি জানি, এই ইলেকট্রিকের যুগ
নারীকে মুক্তি দিয়েছে স্বামী-সেবার দায় থেকে।
আমি চাই কেউ একজন জিজ্ঞেস করুক :
আমার জল লাগবে কি না, নুন লাগবে কি না,
পাটশাক ভাজার সঙ্গে আরও একটা
তেলে ভাজা শুকনো মরিচ লাগবে কি না।
এঁটো বাসন, গেঞ্জি-রুমাল আমি নিজেই ধুতে পারি।

আমি বলছি না ভালোবাসতেই হবে, আমি চাই
কেউ একজন ভিতর থেকে আমার ঘরের দরোজা
খুলে দিক। কেউ আমাকে কিছু খেতে বলুক।
কাম-বাসনার সঙ্গী না হোক, কেউ অন্তত আমাকে
জিজ্ঞেস করুক : ‘তোমার চোখ এতো লাল কেন?’



নির্মলেন্দু গুণ

ওটা কিছু নয়



এইবার হাত দাও, টের পাচ্ছে আমার অস্তিত্ব? পাচ্ছে না?
একটু দাঁড়াও আমি তৈরী হয়ে নিই।
এইবার হাত দাও, টের পাচ্ছে আমার অস্তিত্ব? পাচ্ছে না?
তোমার জন্মান্ত চোখে শুধু ভুল অন্ধকার। ওটা নয়, ওটা চুল।
এই হলো আমার আঙ্গুল, এইবার স্পর্শ করো, - না, না, না,
- ওটা নয়, ওটা কণ্ঠনালী, সরলবিশ্বাসী এক শিল্পীর
মাটির ভাস্কর্য, ওটা অগ্নি নয়, অই আমি — আমার যৌবন।

সুখের সামান্য নিচে কেটে ফেলা যন্ত্রণার কবন্ধ - প্রেমিক,
ওখানে কী খোঁজ তুমি? ওটা কিছু নয়, ওটা দুঃখ ;
রমণীর ভালোবাসা না-পাওয়ার চিহ্ন বুকে নিয়ে ওটা নদী,
নীল হয়ে জমে আছে ঘাসে, - এর ঠিক ডানপাশে , অইখানে
হাত দাও, হ্যাঁ, ওটা বুক, অইখানে হাত রাখো, ওটাই হৃদয়।

অইখানে থাকে প্রেম, থাকে স্মৃতি, থাকে সুখ, প্রেমের সিস্ফনি ;
অই বুকে প্রেম ছিল, স্মৃতি ছিল, সব ছিল তুমিই থাকো নি।



নির্মলেন্দু গুণ

তুলনামূলক হাত



তুমি যেখানেই স্পর্শ রাখো সেখানেই আমার শরীর
তোমার চুলের ধোয়া জল তুমি যেখানেই
খোঁপা ভেঙ্গে বিলাও মাটিকে
আমি এসে পাতি হাত, জলভারে নতদেহ আর
চোখের সামগ্রী নিয়ে ফিরি ঘরে, অথবা ফিরি না ঘরে
তোমার চতুর্দিকে শূন্যতাকে ভরে থেকে যাই
তুমি যেখানেই হাত রাখো, যেখানেই কান থেকে
খুলে রাখো দুল, কণ্ঠ থেকে খুলে রাখো হার
সেখানেই শরীর আমার হয়ে ওঠে রক্তজবা ফুল
তুমি যেখানেই ঠোঁট রাখো সেখানেই আমার চুম্বন
তোমার শরীর থেকে প্রবল অযত্নে বারে যায়?
আমি পোকা হয়ে পিচুটির মতো
তোমার ঐ চোখের ছায়ায় প্রতিদিন খেলা করে যাই
ভালোবেসে নিজেকে কাঁদাই
তুমি শাড়ির আঁচল দিয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিলে
আমি রথ রেখে পথে এসে তোমারই দ্বৈরথে বসে থাকি
তোমার আশায়। তুমি যেখানেই হাত রাখো
আমার উদগ্রীব চিত্র থাকে সেখানেই। আমি যেখানেই
হাত পাতি সেখানেই অসীম শূন্যতা, তুমি নেই।



নীলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অমলকান্তি



জন্ম : ১৯ অক্টোবর ১৯২৪

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
মিলনসাগর
ক্যালকাটা ওয়েব

অমলকান্তি আমার বন্ধু,
ইস্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।
রোজ দেরি করে ক্লাসে আসতো, পড়া পারতো না,
শব্দরূপ জিজ্ঞেস করলে
এমন অবাক হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতো যে
দেখে ভারী কষ্ট হত আমাদের।

আমরা কেউ মাষ্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি সে সব কিছু হতে চায়নি।
সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল!
ক্ষান্তবর্ষে কাক ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর,
জাম আর জামফলের পাতায়
যা নাকি অল্প একটু হাসির মতন লেগে থাকে।

আমরা কেউ মাষ্টার হয়েছি, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।
সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে।
মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে,
চা খায়, এটা ওটা গল্প করে, তারপর বলে, ‘উঠি তাহলে’।
আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমাদের মধ্যে যে এখন মাষ্টারি করে,
অনায়াসে সে ডাক্তার হতে পারত,
যে ডাক্তার হতে চেয়েছিল,
উকিল হলে তার এমন কিছু ক্ষতি হত না।
অথচ সকলেরি ইচ্ছাপূরণ হল, এক অমলকান্তি ছাড়া।
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।
সেই অমলকান্তি, রোদ্দুরের কথা ভাবতে ভাবতে
যে একদিন রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।।



পাবলো নেরুদা



জন্ম : ১২ জুলাই ১৯০৪
মৃত্যু : ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
নোবেল প্রাইজ ডট অর্গ
পয়েম হান্টার
পয়েটস ডট অর্গ
গুগল বুকস
মাদারবার্ড

আজ রাতে আমি সবচেয়ে বিষণ্ণ পঙক্তিমালা লিখতে পারি।
যেমন উদাহরণস্বরূপ লিখতে পারি, ‘রাতটি বিচূর্ণ
এবং নীল নক্ষত্রমালা দূরে কম্পমান।’

রাতের হাওয়া আকাশে ঘুরে ঘুরে গান গায়।

আজ রাতে আমি বিষণ্ণতম পঙক্তিমালা রচনা করতে পারি।
আমি ওকে ভালোবাসতাম এবং কখনো সে আমাকেও ভালোবাসত।

আজকের মতো অনেক রাত জুড়ে আমি ওকে আলিঙ্গন করেছি।
অনন্ত আকাশের নিচে আমি ওকে চুমোর পর চুমো খেয়েছি।

সে আমাকে ভালোবাসত, কখনো আমিও তাকে ভালোবাসতাম
কী করে কেউ ওর দীঘল, প্রশান্ত চোখ ভালো না বেসে পারবে?

সে আমার ভাবনা নয়, তাকে হারিয়ে ফেলেছি অনুভব করা –
আজ রাতে আমি বিষণ্ণতম পঙক্তিমালা রচনা করতে পারি
শোনো, তার বিহনে অধিকতর ভারাক্রান্ত আত্মায় কবিতা
ফসল-ক্ষতে শিশিরের মত ঝরে।

আমার ভালোবাসা ওকে ধরে রাখতে পারেনি
এতে কী এসে যায়? চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে এই রাত আর সে
আমার সঙ্গে নেই।
এটাই সব। দূরে গান গাইছে কেউ, দূরে। তাকে হারিয়েছে
বলে’ আমার আত্মা সম্ভ্রষ্ট নয়।

আমার দৃষ্টি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যেন তার কাছে
যেতে চাইছে। আমার হৃদয় ওকে খুঁজছে, আর সে আমার সঙ্গে নেই।



কবি পরিচিতি

পাবলো নেরুদা স্প্যানিশ ভাষার বিখ্যাত কবি। জন্ম চিলির পারাল নামক স্থানে। তার পুরো নাম রিকার্দো নেফতালি রেয়িসই বাসোয়ালতো। পাবলো নেরুদা তার ছদ্মনাম এবং এ নামেই তিনি সারা পৃথিবীতে পরিচিত। অল্প বয়সে তিনি থেকে কবিতা রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন।

১৯২৭ সালে রেঙ্গুন (বার্মা), বাটাভিয়া, জাভা, সিঙ্গাপুর, ব্রুয়েস আয়ার্স, বার্সিলোনা ও মাদ্রিদে বাণিজ্যদূত হিসেবে কাজ করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ১৯৩৬-৩৭ সালে পারিতে ফ্রান্সের ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠন গড়ে তোলেন এবং নানা স্থানে বক্তৃতা দেন। কবি হিসেবে তিনি সমগ্র লাতিন আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়ার সর্বত্র অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। স্বদেশে ও বিদেশে সম্মানসূচক অনেক পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। অবশেষে ১৯৭১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। প্রায় সারাজীবন তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে মার্কিন সরকার আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ ও চক্রান্তের ফলে এবং সিআইএর সাহায্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলে চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দে নিহত হন। চিলির হাজার হাজার মানুষের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় অত্যাচার। এর মাত্র ১২ দিন পর ১৯৭৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কবি মারা যান।

একই রাত্রি একই গাছগুলোকে সাদা করে ফেলেছে।

সেই সময়ের আমরা আর এক রকম নই।

আমি আর ওকে ভালোবাসি না, এটা নিশ্চিত। অথচ

কী ভালোই না ওকে বাসতাম। আমার কণ্ঠস্বর তার শ্রুতিকে স্পর্শ করার জন্যে বাতাসকে খুঁজত।

অন্যের, সে অন্যের হয়ে যাবে। আমার আগের চুমোর মতো তার কণ্ঠস্বর, তার উজ্জল শরীর, তার অসীম নয়ন।

এটা নিশ্চিত আর ওকে ভালোবাসি না, কিন্তু

হতে পারে আমি ওকে ভালোবাসি। ভালোবাসা

এত ক্ষণস্থায়ী, বিস্মৃতি বড় দীর্ঘস্থায়ী।

কারণ, এ রকম রাতে আমি তাকে আমার বাহুতে

জড়িয়ে ধরেছিলাম, আমার আত্মা তাকে হারিয়ে ফেলেছে।

যদিও আমাকে সে এটা শেষ যন্ত্রণা হিসাবে ভুগিয়েছে

এবং এই শেষের কবিতা তার উদ্দেশ্যেই লিখেছি।

অনুবাদ : শামসুর রাহমান

পূর্ণেন্দু পত্নী

কথোপকথন-৪



জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

মৃত্যু : ১৯ মার্চ ১৯৯৭

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ

ওপেন লাইব্রেরি

আবৃত্তি - সেই গল্পটা

জীবনী

কথোপকথন

মিলনসাগর

- যে কোন একটা ফুলের নাম বল
- দুঃখ।
- যে কোন একটা নদীর নাম বল
- বেদনা।
- যে কোন একটা গাছের নাম বল
- দীর্ঘশ্বাস।
- যে কোন একটা নক্ষত্রের নাম বল
- অশ্রু।
- এবার আমি তোমার ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি।
- বলো।
- খুব সুখী হবে জীবনে।
শ্বেত পাথরে পা।
সোনার পালঙ্কে গা।
এগুতে সাতমহল
পিছোতে সাতমহল।
বর্ণার জলে স্নান
ফোয়ারার জলে কুলকুচি।
তুমি বলবে, সাজবো।
বাগানে মালিনীরা গাঁথবে মালা
ঘরে দাসিরা বাটবে চন্দন।
তুমি বলবে, ঘুমবো।
অমনি গাছে গাছে পাখোয়াজ তানপুরা,
অমনি জোৎস্নার ভিতরে এক লক্ষ নর্তকী।
সুখের নাগর দোলায় এইভাবে অনেকদিন।
তারপর
বুকের ডান পাজরে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে
রক্তের রাঙ্গা মাটির পথে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে
একটা সাপ

পায়ে বালুচরীর নকশা
নদীর বুকে ঝুঁকে-পড়া লাল গোধূলি তার
চোখ
বিয়েবাড়ির ব্যাকুল নহবত তার হাসি,
দাঁতে মুক্তোর দানার মত বিষ,
পাকে পাকে জড়িয়ে ধরবে তোমাকে
যেন বটের শিকড়
মাটিকে ভেদ করে যার আলিঙ্গন।
ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত হাসির রং হলুদ
ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত গয়নায় শ্যাওলা
ধীরে ধীরে তোমার মখমল বিছানা
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে
সাদা।
- সেই সাপটা বুঝি তুমি?
- না।
- তবে?
- স্মৃতি।
বাসর ঘরে ঢোকার সময় যাকে ফেলে
এসেছিলে
পোড়া ধূপের পাশে।

পূর্ণেন্দু পত্রী

কথোপকথন-১১



- তুমি আজকাল বড় সিগারেট খাচ্ছ শুভঙ্কর
এখুনি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি।
কিন্তু তার বদলে?
বড্ড হ্যাংলা। যেন খাওনি কখনো?
- খেয়েছি।
কিন্তু আমার খিদের কাছে সে সব নসি।
কলকাতাকে এক খাবলায় চিবিয়ে খেতে পারি আমি।
আকাশটাকে মত ওমলেটের মত চিরে চিরে
নক্ষত্রগুলোকে চিনেবাদামের মত টুকটাক করে
পাহাড়গুলোকে পঁপড় ভাজার মত মড়মড়িয়ে
আর গঙ্গা?
সে তো এক গ্লাস শরবত।
-থাক। খুব বীর পুরুষ
-সত্যি তাই?
পৃথিবীর কাছে আমি এইরকমই ভয়ংকর বিস্ফোরণ।
কেবল তোমার কাছে এলেই দুধের বালক
কেবল তোমার কাছে এলেই ফুটপাথের নুলো ভিখারী
এক পয়সা, আধ পয়সা কিংবা এক পাউরুটির বেশী
আর কিছু ছিনিয়ে পারি না।
-মিথ্যুক।
-কেন?
-সেদিন আমার সর্বাস্বের শাড়ী ধরে টান মারোনি?
-হতে পারে।
ভিখারীদের কি ডাকাত হতে ইচ্ছে করে না একদিনও?



পূর্ণেন্দু পত্নী

কথোপকথন-৩৯

তোমাকে বাজাই
সমুদ্র-শাঁখ তুমি
গাছে ফুল আসে
ফুলেরা কিশোরী হয় ।
ডালপালাগুলো সবুজ পাতার খামে
চিঠি লিখে লিখে
প্রেম নিবেদন করে ।
ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরে
সমগ্র বনভূমি ।
তোমাকে ভাসাই
মেঘের নৌকো তুমি
তুমি জান লাল
প্রবালের নীল দ্বীপ ।
অমরাবতীর
দরজায় এসে নামো,
খাট-পালঙ্ক
পেতে দেয় জোৎস্নারা ।
বুড়ি চাঁদ এসে ঝাড়-লষ্ঠন জ্বালে ।
পৃথিবীর ফাটা গালে
হেসে ওঠে পূর্ণিমা ।



পূর্ণেন্দু পত্নী

যে টেলিফোন আসার কথা

যে টেলিফোন আসার কথা সে টেলিফোন আসেনি ।
প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে
সূর্য ডোবে রক্তপাতে
সব নিভিয়ে একলা আকাশ নিজের শূন্য বিছানাতে ।
একান্তে যার হাসির কথা হাসেনি ।
যে টেলিফোন আসার কথা আসেনি ।



অপেক্ষমাণ বুকুর ভিতর কাঁসরঘন্টা শাখের উলু
একশ বনের বাতাস এসে একটা গাছে হুলুস্থলু
আজ বুঝি তার ইচ্ছে আছে
ডাকবে আলিঙ্গনের কাছে
দীঘির পাড়ে হারিয়ে যেতে সাঁতার জলের মত্ত নাচে ।
এখনো কি ডাকার সাজে সাজেনি?
যে টেলিফোন বাজার কথা বাজেনি ।

তৃষ্ণা যেন জলের ফোঁটা বাড়তে বাড়তে বৃষ্টি বাদল
তৃষ্ণা যেন ধূপের কাঠি গন্ধে আঁকে সুখের আদল
খাঁ খাঁ মনের সবটা খালি
মরা নদীর চড়ার বালি
অথচ ঘর দুয়ার জুড়ে তৃষ্ণা বাজায় করতালি
প্রতীক্ষা তাই প্রহরবিহীন
আজীবন ও সর্বজনীন
সরোবর তো সবার বুকেই, পদ্ম কেবল পর্দানশীন
স্বপ্নকে দেয় সর্বশরীর, সমক্ষে সে ভাসে না ।
যে টেলিফোন আসার কথা সচরাচর আসে না ।



পূর্ণেন্দু পত্রী

স্মৃতি বড় উচ্ছৃঙ্খল

পুরনো পকেট থেকে উঠে এল কবেকার শুকনো গোলাপ ।
কবেকার? কার দেওয়া? কোন মাসে? বসন্তে না শীতে?
গোলাপের মৃতদেহে তার পাঠযোগ্য স্মৃতিচিহ্ন নেই ।

স্মৃতি কি আমারও আছে? স্মৃতি কি গুছিয়ে রাখা আছে
বইয়ের তাকের মত, লং প্লেইং রেকর্ড ক্যাসেটে
যে রকম সুসংবদ্ধ নথীভুক্ত থাকে গান, আলাপচারীতা?

আমার স্মৃতির বড় উচ্ছৃঙ্খল, দমকা হাওয়া যেন
লুকোচুরি, ভাঙাভাঙি, ওলোটপালটে মহাখুশি
দুঃখেরও দুপুরে গায়, গাইতে পারে, আনন্দ-ভৈরবী ।

আকাশ্জার ডানাগুলি মিশে গেছে আকাশের অন্ধ্রে ও আবীরে
আগুনের দিনগুলি মিশে গেছে সদ্যজাত ঘাসের সবুজে
প্রিয়তম মুখগুলি মিশে গেছে সমুদ্রের ভিতরের নীলে ।

স্মৃতি বড় উচ্ছৃঙ্খল, দুহাজার বছরেও সব মনে রাখে
ব্যর্থের মতন জানে অরণ্যের আদ্যোপান্ত মূর্তি ও মর্মর ।
অথচ কাল বা পরশু কে ডেকে গোলাপ দিল কিছুতে বলবে না ।



বুদ্ধদেব বসু

চিঙ্কায় সকাল



জন্ম : ৩০ নভেম্বর ১৯০৮

মৃত্যু : ১৮ মার্চ ১৯৭৪

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ

মিলনসাগর

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন করে বলি?
কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে;

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিঙ্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
স্টেশনে গাড়ি এসে দাড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চলে গেল! – কী ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন করে বলি?

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায়না।
গোরগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত!
– তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হৃদের ধারে এসে আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি?

রূপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে; সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝরে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে। – এখানে জ্বলে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে?

কাল চিঙ্কায় নৌকায় যেতে-যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কতদূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে। – কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে আর আমার
কী ভালো লেগেছিল।

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। দ্যাখো, দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ-আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন করে বলি।



বিষ্ণু দে

বুড়ো-ভোলানো ছড়া



জন্ম : ১৮ জুলাই ১৯০৯

মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ১৯৮২

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ

কৌরবে বিষ্ণু দে

ওপেন লাইব্রেরি

আয় বৃষ্টি হেনে,
ছাগল দেবো মেনে,
বোমা যাবে ডুবে
ডাকাতের দল উবে।

সুন্দর বনে ভীষণ বাঘ
তাদের চোখে দেশের রাগ
নখে তাদের বেজায় ধার,
খাঁড়ার মতোই দাঁতের সার।

আয় বৃষ্টি হেনে,
ধান বিছালি মেনে
জবাব দেব বোমায়
ডাকাত যেথায় ঘুমায়।

মরা গাঙেও যা কুমির,
নৌকা হবে চৌচির,
গোখরো সাপের দেশ রে ভাই
মারবে শেষে ফণার ঘা-ই।

আয় বৃষ্টি হেনে,
চরকা দেব মেনে,
বোমা যাবে ফেঁসে
এ দেশ সর্বনেশে।

সূর্য আছে অগ্নিবাণ
হিমালয়ের কঠিন গান,
সাগরঘেরা বালির বাঁধ,
তাতের দড়ি চোখের চাঁদ।

আয় বৃষ্টি হেনে,
পরমায়ু দিই মেনে
কামান দাগার বাজে
চোরা পালায় লাজে।

উড়ো জাহাজের নোঙর তোল,
ডাকাত ডিঙির ফাটুক খোল,
এগিয়ে চলি হুঁশিয়ার
তিরিশি কোটির হাতিয়ার।

দুনিয়া দেখে অবাক আজ
তিরিশ কোটি তীরন্দাজ,
সঙ্গে আছে নানান দেশ,
ঘরের খেয়ে বনেই শেষ।

ঘরের ছেলে ঘরেই যা,
দো-দো আনা ভাত ঘরেই খা।
ছ' পণ ছ' কুড়ি
নিয়ে পালায় বুড়ি।
আয় বৃষ্টি হেনে,
সব দিয়েছি মেনে।

বিনয় মজুমদার

আমার আশ্চর্য ফুল



জন্ম : ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

মৃত্যু : ১১ ডিসেম্বর ২০০৬

আমার আশ্চর্য ফুল, যেন চকোলেট, নিমিষেই
গলাধঃকরণ তাকে না ক'রে ক্রমশ রস নিয়ে
তৃপ্ত হই, দীর্ঘ তৃষ্ণা ভুলে থাকি আবিষ্কারে, প্রেমে।
অনেক ভেবেছি আমি, অনেক ছোবল নিয়ে প্রাণে
জেনেছি বিদীর্ণ হওয়া কাকে বলে, কাকে বলে নীল –

আকাশের হৃদয়ের; কাকে বলে নির্বিকার পাখি।
অথবা ফড়িঙ তার স্বচ্ছ ডানা মেলে উড়ে যায়।
উড়ে যায় শ্বাস ফেলে যুবকের প্রাণের উপরে।
আমি রোগে মুগ্ধ হয়ে দৃশ্য দেখি, দেখি জানালায়
আকাশের লালা ঝরে বাতাসের আশ্রয়ে আশ্রয়ে।
আমি মুগ্ধ; উড়ে গেছ; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন
সুর হয়ে লিগু হবো পৃথিবীর সব আকাশে।

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
নব আলোকে বাংলা
কৌরবে বিনয়
ক্যালকাটা ওয়েব
মিলনসাগর



বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গৎLvk



Rb: 1920
gZ: 1985

I t q e j s K

w g j b m v M i
K v j K v U v I t q e
t d m e K d v b t c B R
n v B d v B f t c B R
w e b q w e l q K

K v b v t K k i x i w b t q h v i v i v Z R v t M,
i w i i t j t c i w b t P K v b v i k i x i w b t q K t i h v i v t L j v
c w e x i t m B m e h e K h e Z x
t i v R t f v i t e j v
N t i w K s e v t i t v i v q P v w t q w e U t L t Z t L t Z
n V v r A v K v t k t Q v t o P v i w U K i b v i t X j v
G e s n v R v t i K q i v b K t i A v D U n t q t M t Q
f t j w M t q Z v i v n q n V v r A t M Z
h e Z x t K g t b n q, t K v t b v G K i n t m i Z
K v i t h b w Z g L c v v t q t Q A v g v t i g t Z v t K v t b v c Y q x i K v t Q;
m i i w K K r m Z R v b b v, Z e R v b b g v t P t U i g v t i t b B G B m e L Z

K v b v t K m w i t q t i t L w b K K v M R L v R Z v B,
h e K t K f t j h v B, h e Z x t K t i t i i w L;
Z v i c i t K v t b v w b h w g t b n q
w b w j e w m e t o v, w e e Y, G K v K x,
t c w g K w K D v i g t Z v G K m g m v i w b Z v s B g L n t q t M t Q
A v g v i K x A v t m h v q, Z w o t g t i G M R w g t b w t q h v t e v d w K

A e v K w e Z v w t q m g b R v b v t e v t Z v g v t K,
t n t c w g K, t n D v, t Z v g v t i t t L A w g M t j n e b x

t n w b, t n K v j i w i,
b v n q A v M j v t e v A w g t Z v g v t i w t b i M w j
t Z v g i v w b t e v a n v t Z w Z g L L t R L t R c t o h v t e h L b A m t L,
t Z v g v t i t t L A w g g t i t t Z i w R A v w Q N K v t i v t t L g i v h v q h w
K x A v d h! t m B t Q t j A v g v i k b i t b Z e
A t a K w e U t d t j t i t v t i u t t K
P t j t M t j v t m B t g t q w m t b g v i w e A v c t b i w f t o
W t e t M t j v, Z v i c i K x t h b e j t j v m w t b x t K
g t b n t j v t n w g s l t q g g w b t q l t i w e e v
A v R b P j t Q t h b, e U Z U v t K v t b v g t Z A v t Q Z e w U t K!
n V v r c o t j v t P v t L K v M t R i G w w U w i q v j,
A v t g w i K v f v t j v, P x b f v t j v...
U g v b c v v t e A b A v g v t i K v j
u q R o v t j v

t n h e K, t n h e Z x, c w e x t Z t Z v g v t i K Z U K v g?
K v b v t K k i x i w b t q K v i N t i K q t d v U v w t q t M t j A v t j v?

মল্লিকা সেনগুপ্ত

আপনি বলুন, মার্কস

ছড়া যে বানিয়েছিল, কাঁথা বুনেছিল
দ্রাবিড় যে মেয়ে এসে গম বোনা শুরু করেছিল
আর্যপুরুষের ক্ষেতে, যে লালন করেছিল শিশু
সে যদি শ্রমিক নয়, শ্রম কাকে বলে?

আপনি বলুন মার্কস, কে শ্রমিক, কে শ্রমিক নয়
নতুন যন্ত্রের যারা মাসমাইনের কারিগর
শুধু তারা শ্রম করে!
শিল্পযুগ যাকে বস্তি উপহার দিল
সেই শ্রমিকগৃহিণী
প্রতিদিন জল তোলে, ঘর মোছে, খাবার বানায়
হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শেষে রাত হলে
ছেলেকে পিঠি দিয়ে বসে বসে কাঁদে
সেও কি শ্রমিক নয়!
আপনি বলুন মার্কস, শ্রম কাকে বলে!

গৃহশ্রমে মজুরী হয় না বলে মেয়েগুলি শুধু
ঘরে বসে বিপ্লবীর ভাত রন্ধে দেবে
আর কমরেড শুধু যার হাতে কাস্তে হাতুড়ি!
আপনাকে মানায় না এই অবিচার

কখনো বিপ্লব হলে
পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য হবে
শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন আলোপৃথিবীর সেই দেশে
আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী
হবে?

জন্ম : ২৭ মার্চ ১৯৬০

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
ইন্ডিয়া টুগেদার
পয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল
মিলনসাগর
ক্যালকাটা ওয়েব



মহাদেব সাহা

চিঠি দিও

করণা করে হলেও চিঠি দিও, খামে ভরে তুলে দিও
আঙ্গুলের মিহিন সেলাই

ভুল বানানেও লিখো প্রিয়, বেশি হলে কেটে ফেলো তাও,
এটুকু সামান্য দাবি, চিঠি দিও, তোমার শাড়ির মতো
অক্ষরের পাড়-বোনা একখানি চিঠি।

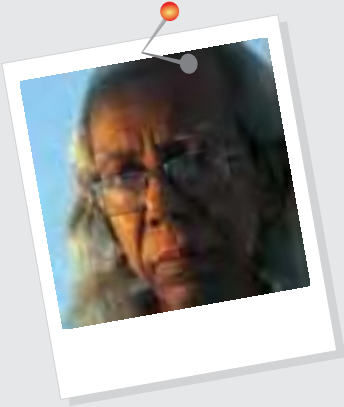
চুলের মতন কোনো চিহ্ন দিও বিস্ময় বোঝাতে যদি চাও ...
বর্ণনা আলস্য লাগে তোমার চোখের মতো চিহ্ন কিছু দিও!

আজো তো অমল আমি চিঠি চাই, পথ চেয়ে আছি,
আসবেন অচেনা রাজার লোক
তার হাতে চিঠি দিও, বাড়ি পৌঁছে দেবে
এমন ব্যস্ততা যদি শুদ্ধ করে একটি শব্দই শুধু লিখো, তোমার কুশল! ...

করণা করে হলেও চিঠি দিও, ভুলে গিয়ে ভুল করে একখানি চিঠি
দিও খামে
কিছুই লেখার নেই তবু লিখো একটি পাখির শিস
একটি ফুলের ছোট নাম,

টুকিটাকি হয়তো হারিয়ে গেছে কিছু, হয়তো পাওনি খুঁজে
সেইসব চুপচাপ কোন দুপুরবেলার গল্প
খুব মেঘ করে এলে কখনো কখনো বড় একা লাগে, তাই লিখো

করণা করে হলেও চিঠি দিও, মিথ্যা করে হলেও বোলো, ভালবাসি!



জন্ম : ৫ আগস্ট ১৯৪৪

ওয়েবলিংক

জীবনী
স্বতন্ত্র জীবন অন্বেষণ



মহাদেব সাহা

শুদ্ধ করো আমার জীবন

তুমি শুদ্ধ করো আমার জীবন, আমি প্রতিটি ভোরের মতো
আবার নতুন হয়ে উঠি,

হই সূর্যোদয়

আমার জীবন তুমি পরিশুদ্ধ করো, আমি প্রস্ফুটিত হই
আমি বহুদিন ঝরা ব্যথিত বকুল অন্ধকারে, আমি বহুদিন
বিষণ্ণ বিধুর ;

একবার আমার মাথায় হাত রাখো, সুপ্রসন্ন হও

এই দণ্ড বুকে করো শ্রাবণের অঝোর বর্ষণ

আমি শ্যামল সবুজ বৃক্ষ হয়ে উঠি ।

তুমি শুদ্ধ করো আমার জীবন, আমি হই সূর্যোদয়,

আমি হই উদিত আকাশ

আমি হয়ে উঠি প্রতিটি শিশুর হাতে প্রথম বানান শেখা বই,

হয়ে উঠি ভোরবেলাকার পাখিদের গান ;

আমার জীবন তুমি শুদ্ধ করো, আমি হই নতুন সবুজ

কোনো দ্বীপ,

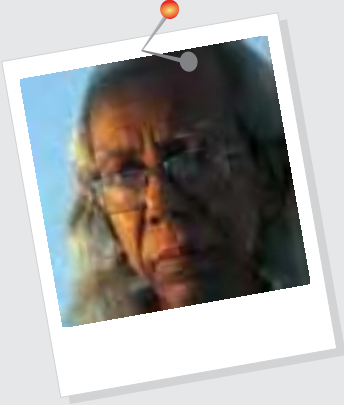
আমি হই বর্ষাকাল, আমি হই বরষার নব জলধারা

আমি বহুদিন ব্যথিত বিষাদ, আমি বহুদিন একা

ঝাউবন ।

তুমি শুদ্ধ করো আমার জীবন, আমি হয়ে উঠি সদ্যফোটা ফুল

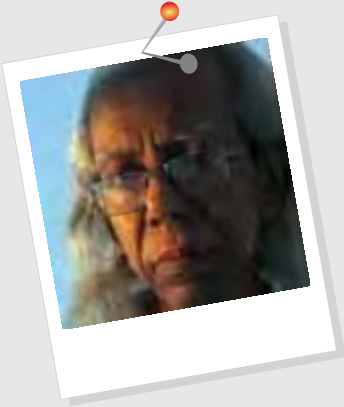
আমি হয়ে উঠি সকালের ঘুমভাঙ্গা চোখ ।



মহাদেব সাহা

সব দুঃখ ভুলে যাই প্রেমের গৌরবে

সব দুঃখ ভুলে যাই প্রেমের গৌরবে, সব ক্লান্তি
দূর করি তোমার ছায়ায়
তুমি এই পৃথিবীর একমাত্র নদী,
প্রাকৃতিক এই জলে ধুয়ে নেই সব দুঃখ গ্লানি
এতো দুঃখের মধ্যেও স্নেহের আঁচলখানি আমার মাথায়;
আমি এই ভালবাসা দিয়ে গ্রীষ্মের রাত্রিকে করি
স্নিগ্ধ ও সজল
কণ্টকিত পথ করি পুষ্পময়,
কেবল প্রেমের গর্বে আজীবন মত্ত হয়ে থাকি।
এইটুকু আমার গরিমা, এইটুকুই আমার বৈভব
এতো বিষাদেও তাই মাঝে মাঝে গ্রীক বীরদের মতো
জেগে উঠি,
দেখি আলো অন্ধকার জীবন এখনো বেশ ভালো
ইচ্ছে হয় আরো ভালবাসা দিয়ে শুধরে নেই জীবনের ভুল।
সব দুঃখ সমস্ত বেদনা এই গর্বে এখনো মধুর মনে হয়
এখনো তো মাঝে মাঝে এই দন্ধ জীবনেও
বয়ে যায় দখিণা বাতাস,
এখনো নিজেকে সুখী ভাবি শুধু এই প্রেমে।
এখনো জীবনে আমি সব দুঃখ ভুলে যাই প্রেমের গৌরবে
সব অশ্রু মুছে ফেলি একটি মুখের দিকে চেয়ে,
ঘোর দুঃসময় এভাবেই অতিক্রম করি
স্নেহেতে মায়াতে বেঁটে থাকি;
সব অশ্রু মুছে ফেলি, সব দুঃখ ভুলে যাই
শুধু এই প্রেমের গৌরবে।



রফিক আজাদ

ভাত দে হারামজাদা



জন্ম : ১৯৪৩

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ

সাক্ষাৎকার

ইউটিউবে আবৃত্তি

বইয়ের তালিকা

ভীষণ ক্ষুধার্ত আছি, উদরে শরীর বৃত্ত ব্যেপে
অনুভূত হতে থাকে – প্রতিপলে – সর্বগ্রাসী ক্ষুধা
অনাবৃষ্টি – যেমন চৈত্রের শস্যক্ষেত্রে – জ্বলে দ্যায়
প্রভুত দাহন – তেমনি ক্ষুধার জ্বালা, জ্বলে দেহ
দুবেলা দুমুঠো পেলে মোটে নেই অন্য কোন দাবি
অনেকে অনেক কিছু চেয়ে নিচ্ছে, সকলেই চায়
বাড়ি, গাড়ি, টাকা কড়ি – কারো বা খ্যাতির লোভ আছে
আমার সামান্য দাবী পুড়ে যাচ্ছে পেটের প্রান্তর
ভাত চাই – এই চাওয়া সরাসরি – ঠান্ডা গরম
সরু বা দারুণ মোটা রেশনের লাল চাল হলে
কোনো ক্ষতি নেই – মাটির শানকি ভর্তি ভাত চাই
দুবেলা দুমুঠো পেলে ছেড়ে দেবো অন্য সব দাবী
অযৌক্তিক লোভ নেই, এমনকি নেই যৌন ক্ষুধা
চাইনি তো ; নাভি নিম্নে – পরা শাড়ি, শাড়ির মালিক
যে চায় সে নিয়ে যাক – যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দাও
জেনে রাখো : আমার ওসবের কোনো প্রয়োজন নেই।

যদি না মেটাতে পারো আমার সামান্য এই দাবী
তোমার সমস্ত রাজ্যে দক্ষযজ্ঞ কান্ড ঘটে যাবে
ক্ষুধার্তের কাছে নেই ইষ্টানিষ্ট আইন কানুন
সম্মুখে যা কিছু পাব খেয়ে যাবো অবলীলাক্রমে ;
থাকবে না কিছু বাকি – চলে যাবে হা ভাতের গ্রাসে।
যদি বা দৈবাৎ সম্মুখে তোমাকে ধরো পেয়ে যাই
রাক্ষুসে ক্ষুধার কাছে উপায়ে উপাচার হবে
সর্বপরিবেশগ্রাসী হলে সামান্য ভাতের ক্ষুধা
ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে নিমন্ত্রণ করে।

দৃশ্য থেকে দ্রষ্টা অন্ধ ধারাবাহিকতা খেয়ে ফেলে
অবশেষে যথাক্রমে খাবো : গাছপালা, নদীনালা
গ্রামগঞ্জ, ফুটপাথ, নর্দমার জলের প্রপাত
চলাচলকারী পথচারী, নিতম্ব প্রধান নারী
উভীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ী
আমার ক্ষুধার কাছেই কিছুই ফেলনা নয় আজ
ভাত দে হারামজাদা
তা না হলে মানচিত্র খাবো।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অসম্ভব



জন্ম : ৭ মে ১৮৬১
মৃত্যু : ৭ আগস্ট ১৯৪১

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া
নোবেল প্রাইজ ডট অর্গ
অনলাইন লিটারেচার
পয়েমহান্টার
ক্যালকাটা ওয়েব
গুগল বুকস
পোয়েট্রি আর্কাইভ

পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে ভাবিনু মনে
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণিনদীর তরল রব-
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।।

এমনি রাত্রে কতবার, মোর বাহুতে মাথা
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে বাঞ্ছিত
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে বৈভব-
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।।

দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে,
আকাশের সুর বাজিছে শিরায় বৃষ্টিধারে।
যুথীবন হতে বাতাসেতে আসে সুধার স্বাদ,
বেণী-বাঁধনের মালায় পেতেম যে সংবাদ
এই তো জেগেছে নবমালতীর সে সৌরভ-
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।।

ভাবনার ভুলে কোথা চলে যাই অন্যমনে
পথসংকেত কত জানায়েছে যে বাতায়নে!
শুনিতো পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান
অশ্রুজলের-আভাসে-জড়িত আমারি গান।
করিবে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব-
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।।

শান্তিনিকেতন
রচনাকাল : ১৬ জুলাই ১৯৪০



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

nwwi†q-hv lqv



†QvÆ Avgvi †g†q
mww†bx†`i WvK †b†Z †c†q
wwwo w`†q bx†Pi Zjvq hw”Qj tm †b†g
AÜKv†i ††q ††q, †_†g †_†g|
nv†Z wQj c`xcLwib,
AvPj w`†q Avovj K†i PjwQj mveavbx|
Avg wQjvg Qv†Z
Zvivq fiv ^Pîgv†mi iv†Z|
nVvr †g†qi Kvbv ††b, D†V
†`L†Z †M†jg Q†U,
wwwoi g†a` †h†Z †h†Z
c`xcUv Zvi wb†e †M†Q evZv†m†Z|
†avB,Zv†i, ôwK n†q†Q evgx?ô
tm †K†` Kq bx†P †_†K, ônwvi†q †MwQ Avg!ô

Zvivq fiv ^Pîgv†mi iv†Z|
wd†i wM†q Qv†Z
g†b nj AvKvk-cv†b †P†q,
Avgvi evgx†i g†ZvB †hb Agwb †K GK †g†q
bxjv††i AvPj Lwib wN†i
`xcwKLwU ewwP†q GKv P†j†Q ax†i ax†i|
wbfZ hw` Av†jv, hw` nVvr †hZ _wig,
AvKvk ††i DVZ †K†`, ‘nwvi†q †MwQ Avg!ô

Kve”MŠ : cjvZKv



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষের কবিতা



কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন-
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ ফাটা তারার ক্রন্দন।
ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়িয়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল-
তুলে নিল দ্রুত রথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহু দূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নব প্রভাতের শিখরচূড়ায়;
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু বিদায়।
কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন-বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাতে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যতিবে আকাশ,
সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রানে-; বিস্মৃতি প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়-
সে আমার প্রেম,
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশ্যে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।



তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি ।
মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা-
পুজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ল্লানস্পর্শ লেগে;
তৃষার্ত আবেগবেগে
ঐষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে ।
তোমার মানস ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধুলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে ।
আজও তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নবিষ্ট তোমার বচন ।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায় ।
হে বন্ধু, বিদায় ।
মোর লাগি করিয়ো না শোক -
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক ।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যের করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই ।
উৎকর্ষ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে ।
গুরুপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃত্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথোলা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি ।
তোমারে যা দিয়েছি তব
পেয়েছে নিঃশেষ অধিকার ।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করণ মুহূর্তগুলি গভুঘ ভরিয়া করে পান
হৃদয় অঞ্জলি হতে মম ।
ওমো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছি সে তোমারি দান;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায় ।
হে বন্ধু বিদায় ।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নির্ব্বারের স্বপ্নভঙ্গ



আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের ‘পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির
গান!
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল
প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া
রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায় –

বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায়
কারার দ্বার।
কেন রে বিধাতা পাষণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন!
ভাঙ রে হৃদয়, ভাঙ রে বাঁধন,
সাধু রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর ‘পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের ‘পরে আঘাত কর।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ
ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব
তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ
আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে – প্রাণ হয়ে
আছে ভোর।।

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ –
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে, চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর –
ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে –
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগরসংগমে
তীর্থস্থান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।

পুণ্যলোভাতুর

মোক্ষদা কহিল আসি, ‘হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথি।’ বিধবা যুবতী,
দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুক্তি,
কেবল মিনতি করে – অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো। ‘স্থান কোথা আর’
মৈত্র কহিলেন তারে। ‘পায়ে ধরি তব’
বিধবা কহিল কাঁদি, ‘স্থান করি লব
কোনমতে এক ধারে।’ ভিজি গেল মন;
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধালো ব্রাহ্মণ,
‘নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে?’
উত্তর করিল নারী, ‘রাখাল? সে রবে
আপন মাসির কাছে। তার জন্ম-পরে
বহুদিন ভুগেছি সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিল না আশা; অনুদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে – সে হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।
দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে।’

সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি জিনিস-পত্তর,
প্রাণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে

ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি দেখে, সেথা আগেভাগে ছুটি
রাখাল বসিয়া আছে তরী- ‘পরে উঠি
নিশ্চিন্ত নীরবে। ‘তুই হেথা কেন ওরে’
মা শুধালো; সে কহিল, ‘যাইব সাগরে।’
‘যাইবি সাগরে! আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।’ পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা, ‘যাইব সাগরে।’
যত তার বাহু ধরি টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
‘থাক থাক, সঙ্গে যাক।’ মা রাগিয়া বলে,
‘চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে!’
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে
বিধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
‘নারায়ণ নারায়ণ’ করিল স্মরণ।
পুত্রে নিল কোলে তুলি, তার সর্ব দেহে
করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তারে ডাকি ধীরে চুপি চুপি কয়,
‘ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।’
রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা –
অনুদা লোকের মুখে শুনি সে বারতা
ছুটে আসি বলে, ‘বাহা, কোথা যাবি ওরে!’
রাখাল কহিল হাসি, ‘চলি সাগরে,
আবার ফিরিব মাসি!’ পাগলের প্রায়
অনুদা কহিল ডাকি, ‘ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে! জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও।
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।’



রাখাল कहिल, 'মাসি, যাইব সাগরে,
আবার ফিরিব আমি।' বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন, 'যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি কোন ভয় নাই।
এখন শীতের দিন, শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই - যাতায়াতে মাস-দুই কাল -
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।'

শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি।
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাতশিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণানদীতীরে।।

যাত্রীদল ফিরে আসে; সাজ হল মেলা,
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্নবেলা
জোয়ারের আশে। কৌতুহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি। জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্রণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্বা সর্পসম ক্রুর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফুা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমুক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুঞ্জে, কী বিপুল টানে
দিগন্তবিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে!

চঞ্চল বালক আসি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে

অধীর উৎসুক কণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
'ঠাকুর, কখন আজি আসিবে জোয়ার?'

সহসা স্তিমিত জালে আবেগসঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ, মৃদু আত্নাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশঙ্গীতে
সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে -
আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি
ত্বরিত উত্তর মুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে,
'দেশে পঁছঁহিতে আর কত দিন আছে?'

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তর বায়ুর বেগে ক্রমে উঠে বেড়ে।
রূপনারানের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। 'তরণী ভিড়াও তীরে'
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর! চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্ধন্ত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা -
অন্য দিকে লুন্ধ ক্ষুন্ধ হিংগ্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক,
কেহ-বা ক্রন্দন করে ছাড়ি উর্ধ্বডাক,
ডাকি আয়োজনে। মৈত্র গুরু পাংশুমুখে



চক্ষু মদি করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
‘বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ –
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা,
করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা
ব্রুদ্র দেবতার সনে।’ যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল।
না করি বিচার। তবু, তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারণ বলকে।
মাঝি কহে পুনর্বীর, ‘দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে, এই বেলা শোন্।’

ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি, ‘এই সে রমণী,
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়!’ ‘দাও তারে ফেলে’
একবাক্যে গর্জি উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে। কহে নারী, ‘হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো!’ দুই দৃঢ় করে
রাখালে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরে।।

ভৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
‘আমি তোর রক্ষাকর্তা! রোষে নিশ্চেষ্টন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষ কালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!
শোধ দেবতার ঋণ, সত্য ভঙ্গ ক’রে
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবী সাগরে!’
মোক্ষদা কহিল, ‘অতি মূর্থ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল! সে যে মিথ্যা কতদূর

তখনি শুনে কি তুমি বোঝ নি ঠাকুর!
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা!
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা!’

বলিতে বলিতে যত মিলি মাঝি-দাঁড়ি
বল করি রাখালে নিল ছিঁড়ি কাড়ি
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি,
দন্তে দন্ত চাপি বলে। কে তারে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা –
দংশিল বৃশ্চিকদংশ। ‘মাসি! মাসি! মাসি!’
বিক্লি বহির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অস্তিমের ডাক।
চিৎকারি উঠিল বিপ্র, ‘রাখ! রাখ! রাখ!’
চকিতে হেরিল চাহি মূর্ছি আছে পড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ-মাঝে মেলি আর্ত চোখ
‘মাসি’ বলি ফুকরিয়া মিলালো বালক
অনন্ততিমিরতলে। শুধু ক্ষীণ মুঠি,
বারেক ব্যাকুল বলে উর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।
‘ফিরায়ে আনিব তোরে’ – কহি উর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্ত-মাঝে বাঁপ দিল জলে।
আর উঠিল না! সূর্য গেল অস্তাচলে।।

রচনাকাল : ১৩ কার্তিক ১৩০৪



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুই বিঘা জমি



শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে ।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে ।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই ।'
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই ।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্বে ও দীঘে সমান হইবে টানা –
ওটা দিতে হবে ।' কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজলচক্ষে, 'করণ রক্ষে গরিবের ভিটেখানি!
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়ী!
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে;
কহিলেন শেষে ক্লুর হাসি হেসে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে ।'

পরে মাস-দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে –
করিল ডিক্রি সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে ।
এ জগতে হয়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি!
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি ।
মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে ।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য –
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য!
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি ।
হাটে মাঠে বাটে এইমত কাটে বছর পনেরো-ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল ।

নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি –
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি ।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি –
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি ।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ –
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল, নিশীথশীতল স্নেহ ।
বুকভরা মধু, বঙ্গের বধু জল লয়ে যায় ঘরে –
'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে ।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে,
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে –



রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁছলিঁনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

ধিক্ ধিক্ ওরে, শত ধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি,
যখনি যাহার তখনি তাহার – এই কি জননী তুমি!
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাক-পাতা!
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাসবেশ –
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ!
আমি তোমার লাগি ফিরেছি বিবাগি গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস দিন!
ধনীর আদরে গরব না ধরে! এতই হয়েছে ভিন্ন –
কোনোখানে লেশ নাই অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন!
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অযড়, ক্ষুধাহরা সুধারানি।
যত হাসো আজ যত করো সাজ ছিলে দেবী – হলে দাসী।

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আমগাছ, একি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম –
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম;
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন –
ভাবিলাম, হয়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা –
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা!

হেনকালে হয় যমদূত-প্রায় কোথা হতে এল মালী,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি!
কহিলাম তবে, ‘আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব –
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!’
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ;
বারু ছিপ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, ‘মারিয়া করিব খুন!’
বারু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, ‘শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!’
বারু কহে হেসে, ‘বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।’
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে!
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলাকা

সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার!
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার-তরু সারে সারে;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি –
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি?
সহসা শুনিবু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ওই পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অঙ্গররমণী,
গেল চলি স্তম্ভতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,
শিহরিল দেওদার-বন?
মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগি!
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে –
হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে!



রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

বাতাসে লাশের গন্ধ



জন্ম : ১৬ অক্টোবর ১৯৫৬

মৃত্যু : ২১ জুন ১৯৯১

ওয়েবলিংক

ফেসবুক ফ্যান পেইজ

আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই,
আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি,
ধর্মিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে-
এ-দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?

বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে,
মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ।
এই রক্তমাখা মাটির ললাট ছুঁয়ে একদিন যারা বুক বেঁধেছিলো,
জীর্ণ জীবনের পুঁজে তারা খুঁজে নেয় নিষিদ্ধ আঁধার।
আজ তারা আলোহীন খাঁচা ভালোবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায়।

এ-যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আড়ষ্ট কুমারী জননী,
স্বাধীনতা-একি তবে নষ্ট জন্ম?
এ-কি তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল?

জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন।

বাতাসে লাশের গন্ধ-
নিয়ন আলোয় তবু নর্তকীর দেহে দোলে মাংসের তুফান।
মাটিতে রক্তের দাগ-
চালের গুদামে তবু জমা হয় অনাহারী মানুষের হাড়।

এ-চোখে ঘুম আসে না। সারারাত আমার ঘুম আসে না-
তন্দ্রার ভেতরে আমি শুনি ধর্মিতার করুণ চিৎকার,
নদীর পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ,
মুন্ডুহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বীভৎস শরীর
ভেসে ওঠে চোখের ভেতরে-আমি ঘুমুতে পারি না,
আমি ঘুমুতে পারি না

রক্তের কাফনে মোড়া- কুকুরে খেয়েছে যারে, শকুনে খেয়েছে যারে,
সে আমার ভাই, সে আমার মা, সেই আমার প্রিয়তম পিতা।
স্বাধীনতা- সে আমার স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন,
স্বাধীনতা-সে আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল।

ধর্মিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা।



শক্তি চট্টোপাধ্যায়

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো

ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।

এতো কালো মেখেছি দু হাতে
এতোকাল ধরে!
কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবিনি।

এখন খাদের পাশে রান্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোন দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
একাকী যাবো না অসময়ে।।

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
ক্যালকাটা ওয়েব
আবৃত্তি - তোমাদের সঙ্গে
শক্তির কবিতা
গুগল বুকস



জন্ম : ২৫ নভেম্বর ১৯৩৪

মৃত্যু : ২৩ মার্চ ১৯৯৫



শক্তি চট্টোপাধ্যায়

চতুর্দশপদী কবিতাবলী



ভালোবাসা পেলে সব লভভন্ড করে চলে যাবো
যেদিকে দুচোখ যায়- যেতে তার খুশি লাগে খুব।
ভালোবাসা পেলে আমি কেন পায়সান্ন খাবো
যা খায় গরিবে, তাই খাবো বহুদিন যত্ন করে।
ভালোবাসা পেলে আমি গায়ের সমস্ত মুঞ্চকারী
আবরণ খুলে ফেলে দৌড় ঝাঁপ করবো কড়া রোদে...
ভালোবাসা পেলে জানি সব হবে। না পেলে তোমায়
আমি কি বোবার মতো বসে থাকবো-
ভালোবাসা না পেলে কি আমার এমনি দিন যাবে
চোরের মতন, কিংবা হাহাকারে সোচ্চার, বিমনা -
আমি কি ভীষণভাবে তাকে চাই ভালোবাসা জানে।

মেঘ ডাকছে

মেঘ ডাকছে ডাকুক
আমার কাছেই থাকুক
ভালো থাকবো, সুখে থাকবো - এই বাসনা রাখুক।

কষ্ট হয়তো একটু হবে, এই তো ছিরির ঘর
আমার কাছে অল্প সময় বাইরে অতঃপর -
বৃষ্টি ভালো লাগছে যখন, পদ্মপাতায় রাখুক।

ওইটুকু তো মেয়ে
ছোট্ট আমার চেয়ে
এতোই যদি লজ্জা তাহার, দু হাতে মুখ ঢাকুক
আমার কাছে থাকুক, তবু আমার কাছে থাকুক।



শক্তি চট্টোপাধ্যায়

একবার তুমি

একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো –
দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো ।



বুকের ভেতর কিছু পাথর থাকা ভালো- ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়
সমস্ত পায়ে-হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ওই পাথরের পাল একের পর এক বিছিয়ে
যেন কবিতার নগ্ন ব্যবহার, যেন ঢেউ, যেন কুমোরটুলির সালমা-চুমকি-জরিমাখা প্রতিমা
বহুদূর হেমন্তের পাঁশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত দেখে আসতে পারি ।

বুকের ভেতরে কিছু পাথর থাকা ভাল
চিঠি-পত্রের বাস্তু বলতে তো কিছু নেই – পাথরের ফাঁক-ফোকরে রেখে এলেই কাজ
হাসিল-
অনেক সময় তো ঘর গড়তেও মন চায় ।

মাছের বুকের পাথর ক্রমেই আমাদের বুকে এসে জায়গা করে নিচ্ছে
আমাদের সবই দরকার । আমরা ঘরবাড়ি গড়বো – সভ্যতার একটা স্থায়ী স্তম্ভ তুলে ধরবো
রূপোলী মাছ পাথর ঝরাতে ঝরাতে চলে গেলে
একবার তুমি ভালবাসতে চেষ্টা করো ।



শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমিও একদিন

আলো আর অন্ধকার

দু-জনে দু-জনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে

মুখ ফিরিয়ে আছে – যাতে কেউ কাউকে না দ্যাখে

দেখার অনেক কষ্ট – ট্রামলাইন পার হয়ে পাশাপাশি বাড়ির বসে থাকা অন্তরঙ্গভাবে

আলো আর অন্ধকার

দু-জনে দু-জনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

একবার মুখ ফেরালে কী এমন দ্বিভুবন অন্ধকার হয়ে যাবে - এই বলে

আলো

মুখ ফেরালো

আর তখনই বানবানাং চাবির থোলো মেঝেয় ফেলে, লুটিয়ে আঁচল

ঘন বনের ভিতর বাঁপিয়ে পড়লো অন্ধকার

ওদিক-পানেই বাড়ি তার, বাগ-বাগিচা, ফলমূল, সৈকতাবাস।

বহুক্ষণ বনের ধারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আলো-

অন্ধকারেরও তো উকিঝুঁকি আছে

আছে ফাঁক-ফোকর ডাকবান্স আর কী-হোল

চোখটি কাৎ করে লাগিয়েছো কি অমনি আলোর বর্ষা বিঁধবে গিয়ে বাছাধনের চোখে

মজাটি টের পাবে তখনই

একচক্ষু কালো মেয়েটার বর জুটবে কোথেকে হে?

এভাবে বনের ভেতর আর বনের বাহির ঘন হয়ে উঠলো ঝগড়ায়

সালতামামি শেষ হলো, ছুটি হয়ে গেল ইস্কুল-পাঠশালা

মাঠের বল মাঠেই রইলো পড়ে

আলো ভাবলো, চিরদিন বাঁচে না মানুষ!

অন্ধকারও বেঁচে নেই – সুতরাং

একাকী যদি জ্বলতে পারি, জ্বলতে-জ্বলতে একদিন ওরই মতন ফুরিয়ে যাবো

আমার কী? আমিই বা কতদিন অপেক্ষা করবো!

আমার কি ট্রেন-ফেন ধরার তাড়া নেই?



শক্তি চট্টোপাধ্যায়

চাবি

আমার কাছে এখনো পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি
কেমন করে তোরঙ্গ আজ খোলো!

থুৎনি ‘পরে তিল তো তোমার আছে
এখন? ও মন, নতুন দেশে যাবি?
চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো।

চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো –
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?

অবাস্তব স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু – ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?



শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অবনী বাড়ি আছো?

অবনী বাড়ি আছো
দুয়ার ঐটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাজুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে –
'অবনী বাড়ি আছো?'

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'



শহীদ কাদরী

বৃষ্টি, বৃষ্টি



জন্ম : ১৯৪২

ওয়েবলিংক

শহীদ কাদরীর সঙ্গে কিছুক্ষণ

সহসা সম্রাস ছুঁলো। ঘর-ফেরা রঙিন সন্ধ্যার ভীড়ে
যারা তন্দ্রালস দিগ্বিদিক ছুটলো, চৌদিকে
ঝাঁকে ঝাঁকে লাল আরশোলার মত যেন বা মড়কে
শহর উজাড় হবে, — বলে গেল কেউ — শহরের
পরিচিত ঘণ্টা নেড়ে খুব ঠাণ্ডা এক ভয়াল গলায়

এবং হঠাৎ
সুগোল তিমির মতো আকাশের পেটে
বিদ্ব হলো বিদ্যুতের উড়ন্ত বল্লম!
বজ্র-শিলাসহ বৃষ্টি, বৃষ্টি : শ্রুতিকে বধির ক'রে
গর্জে ওঠে যেন অবিরল করাত-কলের চাকা,
লক্ষ লেদ-মেশিনের আর্ত অফুরন্ত আবর্তন!

নামলো সন্ধ্যার সঙ্গে অগ্রসন্ন বিপন্ন বিদ্যুৎ
মেঘ, জল, হাওয়া, —
হাওয়া, ময়ূরের মতো তার বর্ণালী চিৎকার,
কী বিপদগ্রস্থ ঘর-দোর,
ডানা মেলে দিতে চায় জানালা-কপাট
নড়ে ওঠে টিরোনসিরসের মতন যেন প্রাচীন এ-বাড়ি!
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় জনারণ্য, শহরের জানু
আর চকচকে ঝলমলে বেসামাল এভিনিউ

এই সাঁঝে, প্রলয় হাওয়ার এই সাঁঝে
(হাওয়া যেন ইস্রাফিলের ওঁ)
বৃষ্টি পড়ে মৌরের বনেটে টেরচা,
ভেতরে নিস্তর্র যাত্রী, মাথা নীচু
ত্রাস আর উৎকর্ষায় হঠাৎ চমকে
দ্যাখে, — জল
অবিরল



জল, জল, জল
তীব্র, হিংস্র
খল,
আর ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় শোনে
ক্রন্দন, ক্রন্দন
নিজস্ব হৃৎপিণ্ডে আর অদ্ভুত উড়োনচণ্ডী এই
বর্ষার উষর বন্দনায়

রাজত্ব, রাজত্ব শুধু আজ রাতে, রাজপথে-পথে
বাউগুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের, উন্মূল, উদ্বাস্ত
বালকের, আজীবন ভিক্ষুকের, চোর আর অর্ধ-উন্মাদের
বৃষ্টিতে রাজত্ব আজ। রাজস্ব আদায় করে যারা,
চিরকাল গুণে নিয়ে যায়, তারা সব অসহায়
পালিয়েছে ভয়ে।

বন্দনা ধরেছে, — গান গাইছে সহর্ষে
উৎফুল্ল আঁধার প্রেক্ষাগৃহ আর দেয়ালের মাতাল প্ল্যাকার্ড,
বাঁকা-চোরা টেলিফোন-পোল, দোল খাচ্ছে ওই উঁচু
শিখরে আসীন, উড়ে-আসা বুড়োসুড়ো পুরোন সাইনবোর্ড
তাল দিচ্ছে শহরের বেগুনার খড়খড়ি
কেননা সিপাই, সাক্ষী আর রাজস্ব আদায়কারী ছিল যারা,
পালিয়েছে ভয়ে।

পালিয়েছে, মহাজ্ঞানী, মহাজন, মোসাহেবসহ
অন্তর্হিত,
বৃষ্টির বিপুল জলে ভ্রমণ-পথের চিহ্ন
ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে
কেবল করুণ কঁটা
বিমর্ষ স্মৃতির ভার নিয়ে সহর্ষে সদলবলে
বয়ে চলে জল পৌরসমিতির মিছিলের মতো
নর্দমার ফোয়ারার দিকে, —

ভেসে যায় ঘুঙুরের মতো বেজে সিগারেট-টিন



ভাঙা কাচ, সন্ধ্যার পত্রিকা আর রঙিন বেলুন
মসৃণ সিল্কের স্কার্ফ, ছেঁড়া তার, খাম, নীল চিঠি
লন্ড্রির হলুদ বিল, প্রেসক্রিপশন, শাদা বাক্সে ওষুধের
সৌখিন শার্টের ছিন্ন বোতাম ইত্যাদি সভ্যতার
ভবিতব্যহীন নানা স্মৃতি আর রঙবেরঙের দিনগুলি

এইক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায়, বিদ্যুতে
নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাংলুনে একাকী
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে
ঝকঝকে, সদ্য, নতুন নৌকার মতো একমাত্র আমি,
আমার নিঃসঙ্গে তথা বিপর্যস্ত রক্তমাংসে
নূহের উদ্দাম রাগী গরগরে গলা আত্মা জ্বলে
কিন্তু সাড়া নেই জনপ্রাণীর অথচ
জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসের স্বর, বাতাসে চিৎকার,
কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে
জলের আল্লাদে আমি একা ভেসে যাবো?



শহীদ কাদরী

তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা

ভয় নেই

আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সেনাবাহিনী
গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে
মার্চপাস্ট করে চলে যাবে
এবং স্যাণ্ডিট করবে
কেবল তোমাকে প্রিয়তমা।

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো

বন-বাদাড় ডিঙ্গিয়ে
কাঁটা-তার, ব্যারিকেড পার হয়ে, অনেক রণাঙ্গনের স্মৃতি নিয়ে
আর্মাড-কারগুলো এসে দাঁড়াবে
ভায়োলিন বোঝাই করে
কেবল তোমার দোরগোড়ায় প্রিয়তমা।

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো-

বি-৫২ আর মিগ-২১গুলো
মাথার ওপর গাঁ-গাঁ করবে
ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
চকোলেট, টফি আর লজেন্সগুলো
প্যারট্রুপারদের মতো ঝরে পড়বে
কেবল তোমার উঠোনে প্রিয়তমা।

ভয় নেই...আমি এমন ব্যবস্থা করবো

একজন কবি কমান্ড করবেন বঙ্গোপসাগরের সবগুলো রণতরী
এবং আসন্ন নির্বাচনে সমরমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়
সবগুলো গণভোট পাবেন একজন প্রেমিক, প্রিয়তমা!

সংঘর্ষের সব সম্ভাবনা, ঠিক জেনো, শেষ হবে যাবে-

আমি এমন ব্যবস্থা করবো, একজন গায়ক
অনায়াসে বিরোধীদের অধিনায়ক হয়ে যাবেন



সীমান্তের ত্রেঞ্চগুলোয় পাহারা দেবে সারাটা বৎসর
লাল নীল সোনালি মাছি-
ভালোবাসার চোরাচালান ছাড়া সবকিছু নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, প্রিয়তমা ।

ভয় নেই আমি এমন ব্যবস্থা করবো মুদ্রাস্ফীতি কমে গিয়ে বেড়ে যাবে
শিল্পোত্তীর্ণ কবিতার সংখ্যা প্রতিদিন
আমি এমন ব্যবস্থা করবো গণরোষের বদলে
গণচুম্বনের ভয়ে
হস্তারকের হাত থেকে পড়ে যাবে ছুরি, প্রিয়তমা ।

ভয় নেই,
আমি এমন ব্যবস্থা করবো
শীতের পার্কের ওপর বসন্তের সংগোপন আক্রমণের মতো
অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে-বাজাতে বিপ্লবীরা দাঁড়াবে শহরে,

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
স্টেটব্য্যাংকে গিয়ে
গোলাপ কিম্বা চন্দ্রমল্লিকা ভাঙলে অন্তত চার লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে
একটি বেলফুল দিলে চারটি কার্ডিগান ।
ভয় নেই, ভয় নেই
ভয় নেই,
আমি এমন ব্যবস্থা করবো
নৌ, বিমান আর পদাতিক বাহিনী
কেবল তোমাকেই চতুর্দিক থেকে ঘিরে-ঘিরে
নিশিদিন অভিবাদন করবে, প্রিয়তমা ।



শহীদ কাদরী

সঙ্গতি

বন্য শূকর খুঁজে পাবে প্রিয় কাদা
মাছরাঙা পাবে অন্বেষণের মাছ।
কালো রাতগুলো বৃষ্টিতে হবে শাদা
ঘন জঙ্গলে ময়ূর দেখাবে নাচ

প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই
কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না...

একাকী পথিক ফিরে যাবে তার ঘরে
শূন্য হাঁড়ির গহ্বরে অবিরত
শাদা ভাত ঠিক উঠবেই ফুটে তারাপুঞ্জের মতো,
পুরনো গানের বিস্মৃত-কথা ফিরবে তোমার স্বরে

প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই
কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না...

ব্যারাকে ব্যারাকে থামবে কুচকাওয়াজ
ক্ষুধার্ত বাঘ পেয়ে যাবে নীলগাই,
গ্রামান্তরের বাতাস আনবে স্বাদু আওয়াজ
মেয়েলি গানের-তোমরা দু'জন একঘরে পাবে ঠাঁই

প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই
কিন্তু শান্তি পাবে না,পাবে না,পাবে না.....



শহীদ কাদরী

হস্তারকদের প্রতি

বাঘ কিংবা ভালুকের মতো নয়,
বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা হাঙরের দল নয়
না, কোনো উপমায় তাদের গ্রেপ্তার করা যাবে না
তাদের পরনে ছিল ইউনিফর্ম
বুট, সৈনিকের টুপি,
বঙ্গবন্ধুর সাথে তাদের কথাও হয়েছিলো,
তারা ব্যবহার করেছিল
এক্কেবারে খাঁটি বাঙালির মতো
বাংলা ভাষা। অস্বীকার করার উপায় নেই ওরা মানুষের মতো
দেখতে, এবং ওরা মানুষই
ওরা বাংলা মানুষ
এর চেয়ে ভয়াবহ কোনো কথা আমি আর শুনবো না কোনোদিন।



শূন্যতা

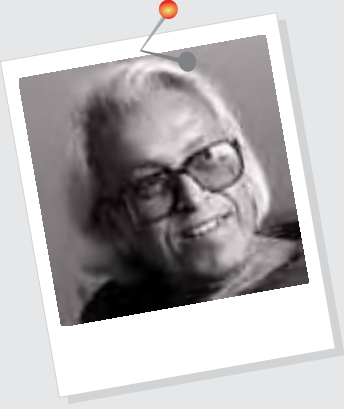
এখন আমার সেই মুহূর্ত
যখন আমার চাই
নীলচক্ষের তীব্র চাহনি, সোনালি চুলের ঝাপটা,
আসুক আমার করতলে সেই দারুণ ধূর্ত
বর্গোজ্জ্বল পলায়নপটু মাছটা।
এখন যখন সকলি শূন্য কোথাও কিছু নেই
এক্ষুনি আমি চাই
চক্ষে-বক্ষে মহিলা তোমার সোনালি চুলের ঝাপটা
কেটে যাক এই হতাশাদীর্ঘ মৃত ও শীর্ণ কৃশকায় কালো রাতটা।



শামসুর রাহমান

আসাদের শার্ট

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়।



জন্ম : ২৪ অক্টোবর ১৯২৯
মৃত্যু : ১৭ আগস্ট ২০০৬

ওয়েবলিংক

বোন তার ভায়ের অঙ্গান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায়
বর্ষীয়সী জননী সে-শার্ট
উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন স্নেহের বিন্যাসে।

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চুড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে

উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-বালসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।

আমাদের দুর্বলতা, ভীর্ণতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

উইকিপিডিয়া পেইজ
সার্ক রাইটার্স ফাউন্ডেশন
শামসুর রাহমানের জীবনী
লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস প্রজেক্ট
বইয়ের তালিকা
ইঠিকানায় রাহমানের কবিতা
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা
দ্য গার্ডিয়ানে অবচুয়ারি
কিছু স্মৃতি
দুর্লভ সাক্ষাৎকার
রাহমানের কবিতা : আল মাহমুদ
ভিজউইকি পেইজ



শামসুর রাহমান

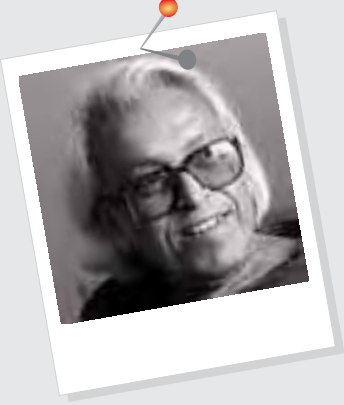
কবিকে দিও না দুঃখ

কবিকে দিও না দুঃখ দিলে সে-ও জলে স্থলে হাওয়ায় হাওয়ায়
নীলিমায় গেঁথে দেবে দুঃখের অক্ষর। কবি তার নিঃসঙ্গতা
কাফনের মতো মুড়ে রাখে আপাদমস্তক, হাঁটে
ফুটপাতে একা,
দালানের চুড়ায় চুড়ায়, দিগন্তের অন্তরালে
কেমন বেড়ায় ভেসে, চাঁদের নিকট যায়, নক্ষত্র ছিটোয় যত্রতত্র
খোলামকুচির মতো। তাকে দুঃখ দিও না, চৌকাঠ থেকে দূরে
দিও না ফিরিয়ে।
ফেরালে নক্ষত্র, চাঁদ করবে ভীষণ হরতাল, ছায়াপথ তেজস্ক্রিয়
শপথ পড়বে বারে, নিমেষেই সব ফুল হবে নিরুদ্দেশ।

প্রায়শ পথের ধারে ল্যাম্পোস্টে হেলান দিয়ে খুব
প্রচ্ছন্ন দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো বা সীমাহীন রিজুতায়
রেস্তোরাই বসে
বান্ধববিহীন বিষাদের মুখোমুখি
নিজেই বিষাদ হ'য়ে। মাঝে মধ্যে চৌরাস্তা খুঁড়ে তোলে এক
গোপন ফোয়ারা পিপাসার্ত পথিকের আঁজলা ভরবে ব'লে।
আবার কখনো তার মগজের উপবনে লুকোচুরি খেলে
খুনী ও পুলিশ!

মধ্যরাতে শহরের প্রতিটি বাড়ির দরজায় কিছু ফুল
রেখে আসে নিরিবিলি কাউকে কিছু না ব'লে। কবি সম্মেলনে
রাজধানী আর মফস্বলে স্টেজে কয়েক ডজন
পঙ্ক্তির জোৎস্নায় রৌদ্রে পুনরায় স্নান সেরে স্বকীয় গোপন ঘুলঘুলিটার
দিকে চোখ রেখে নীলিমার সঙ্গে বাণিজ্যের কথা ভাবে, ভাবে
সুদূর অনন্ত তাকে চোখ টিপে বেঘোরে ঘোরাবে কতো আর?
কবি সম্মেলনে তেজী যুবরাজ, প্রেমের নিকট বাস্তবিক
বড়ো নগ্ন, বড়ো অসহায়!

কবিকে দিওনা দুঃখ, স্বপ্নের আড়ালে তাকে তীব্র
আবৃত্তি করতে দাও পাথর, পাখির বুক, গাছ,
রমণীয় চোখ,
তুক, হেঁটে যেতে দাও ছায়াচ্ছন্ন পথে, দাও সাঁতার কাটতে বায়ুস্তরে একা,
অথবা থাকতে দাও ভিড়ে নিজের ভেতরে। রোজ
হোক সে রূপান্তরিত বার বার। নিজস্ব জীবন রেখেছে সে
গচ্ছিত সবার কাছে নানান ধরনে অকপট।
কবিকে দিও না দুঃখ, একান্ত আপন দুঃখ তাকে
খুঁজে নিতে দাও।



শামসুর রাহমান

এই মাতোয়ালা রাইত

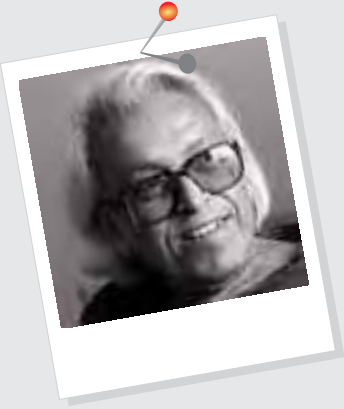
হালায় আজকা নেশা করছি বহুত। রাইতের
লগে দোস্তি আমার পুরানা, কান্দুপট্টির খানকি
মাগীর চক্ষুর কাজলের টান এই মাতোয়ালা
রাইতের তামাম গতরে। পাও দুইটা কেমন
আলগা আলগা লাগে, গাঢ়া আবরের সুনসান
আন্দরমহলে হাঁটে। মগর জমিনে বান্ধা পাও

আবে, কোন্ মামদির পো সামনে খাড়ায়? যা কিনার,
দেহস না হপায় রাস্তায় আমি নামছি, লৌড় দে;
না অইলে হোগায় লাথুথি খাবি, চটকানা গালে।
গতরের বিটায় চেরাগ জ্বলতাছে বেগুমার।

আমারে হগলে কয় মইফার পোলা, জুম্মনের
বাপ, হস্না বানুর খসম, কয় সুবরাতি মিস্ত্রি।
বেহায়া গলির চাম্পা চুমাচাউ দিয়া কয়, 'তুমি
ব্যাপারী মনের মানু আমার, দিলের হকদার।'

আমার গলায় কার গীত হুনি ঠাণ্ডা আঁসুভরা?
আসলে কেউগা আমি? কোন্হানতে আইছি হালায়
দাগাবাজ দুনিয়ায়? কেবা যামু আখেরে ওস্তাদ?
চুড়িহাট্টা, চান খাঁর পুল, চকবাজার, আশক
জমাদার লেইন, বংশাল; যেহানেই মকানের
ঠিকানা থাউক, আমি হেই একই মানু, গোলগাল
মাথায় বাবরি; থুতনিতে ফুদি দাড়ি, গালে দাগ,
যেমুন আধলি একখান খুব দূর জামানার।

আমার হাতের তালু জবর বেগানা লাগে আর
আমার কইলজাখান, মনে অয়, আরেক মানুর
গতরের বিতরে ফাল পাড়ে; একটুকু চৈন নাই
মনে, দিল জিজিরার জংলা, বিরান দালান। জানে



হায়বৎ জহরীলা কেঁকড়ার মতন হাঁটা-ফিরা
করে আর রাইতে এমুনবি অয় নিজেরেও বড়
ডর লাগে, মনে অয় যেমুন আমিবি জমিনের
তলা খন উইঠা আইছি বহুত জমানা বাদ ।

এ-কার মৈয়ত যায় আন্ধার রাইতে? কোন ব্যাটা
বিবি-বাচ্চা ফালাইয়া বেহুদা চিত্তর অইয়া আছে
একলা কাঠের খাটে বেফিকির, নোওয়াব যেমুন?
বুঝছোনি হউরের পো, এলা আজরাইল আইলে
আমিবি হান্দামু হ্যাষে আন্ধার কব্বরে । তয় মিয়া
আমার জেবের বিতরের লোটের মতই হাচা মৌত ।

এহনবি জিন্দা আছি, এহনবি এই নাকে আছে
গোলাব ফুলের বাস, মাঠার মতন চান্নি দিলে
নিরীলা ঝিলিক মারে । খোওয়াবের খুব খোবসুরৎ
মাইয়া, গহীন সমুন্দর, হুন্দর পিনিস আর
আসমানী হুরীর বারাত; থিড়কির রৈদ, বুুম
কাওয়ালীর তান, পৈখ সুনসান বানায় ইয়াদ ।
এহনবি জিন্দা আছি, মৌতের হোগায় লাথথি দিয়া
মৌত তক সহিসালামত জিন্দা থাকবার চাই ।

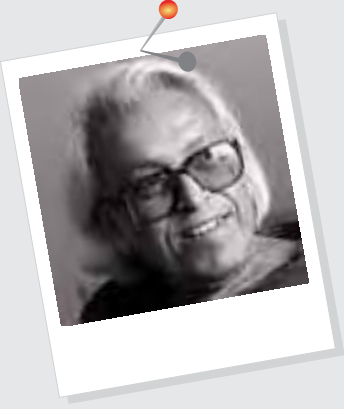
তামাম দালান কোঠা, রাস্তার কিনার, মজিদের
মিনার, কলের মুখ, বেগানা মৈয়ত, ফজরের
পৈখের আওয়াজ, আন্ধা ফকিরের লাঠির জিকির-
হগলই খোওয়াব লাগে আর এই বান্দাবি খোওয়াব!



শামসুর রাহমান

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?



তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাইয়ের রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মত চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস বস্তু উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে ব'লে, ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে ব'লে, বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তুপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের উপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে এক থুথুরে বুড়ো
উদাস দাওয়ায় ব'সে আছেন — তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্নের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধ'রে দক্ষ ঘরের।





স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
বসে আছে পথের ধারে।
তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী ব'লে নৌকা চালায় উদ্দান ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিকশাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকের দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুড়ে বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হ'তে চলেছে —
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকেই আসতে হবে, হে স্বাধীনতা।



সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিন্নমুকুল



জন্ম : ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২

মৃত্যু : ২৫ জুন ১৯২২

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
মিলনসাগর

সবচেয়ে যে ছোট পিড়ি খানি
সেখানি আর কেউ রাখেনা পেতে,
ছোট থালায় হয় নাকো ভাতবাড়া
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে।
বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট
খাবার বেলা কেউ ডাকে না তাকে।
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল,
তারই খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সবচেয়ে যে অল্পে ছিল খুশি,
খুশি ছিল ঘেঘাঘেঘির ঘরে,
সেই গেছে হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে,
দিয়ে গেছে জায়গা খালি করে।
ছেড়ে গেছে পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি।
ভয়ভরা সে ছিল যে সব চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি।

হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে ওরে!
হারিয়ে গেছে 'বোল' বলা সেই বাঁশি
দুধে ধোওয়া কচি সে মুখখানি
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলী ফুলের রাশি,
তুকেছে হায় শ্মশান ঘরের মাঝে
ঘর ছেড়ে হায় হৃদয় শ্মশানবাসী।

সবচেয়ে যে ছোট কাপড়গুলি
সেইগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোট,
আজকে সেটি শূন্য পড়ে কাঁদে।
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে সরে।
ছোট্ট যে জন ছিল রে সবচেয়ে,
সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

ছাড়পত্র



জন্ম : ১৫ আগস্ট ১৯২৬

মৃত্যু : ১৩ মে ১৯৪৭

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
ক্যালকাটা ওয়েব
ফেসবুক ফ্যান পেইজ
বর্ণমালা প্রজেক্ট
সুকান্তের কবিতা

যে শিশু ভুমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে ।

খর্বদেহ নিঃসহায় তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায় ।

সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার ।

আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের –
পরিচয় পত্র পড়ি ভুমিষ্ঠ শিশুর,
অস্পষ্ট কুয়াশা ভরা চোখে ।

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের ।

চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপনে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি –
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার ।

অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হবো ইতিহাস ।



সুকান্ত ভট্টাচার্য

চারাগাছ



ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকি :
পাশে এক বিরাট প্রাসাদ
প্রতিদিন চোখে পড়ে;
সে প্রাসাদ কি দুঃসহ স্পর্ধায় প্রত্যহ
আকাশকে বন্ধুত্ব জানায়,
আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি-
এ অট্টালিকার প্রতি ইটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে অত্যন্ত গোপনে,
ঘামের, রক্তের আর চোখের জলের।
তবু এই প্রাসাদকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে
সেলাম জানায় লোকে, চেয়ে থাকে বিমূঢ় বিস্ময়ে।
আমি তাই এ প্রাসাদে এতকাল ঐশ্বর্য দেখেছি,
দেখেছি উদ্ধত এক বনিয়াদী কীর্তির মহিমা।

হঠাৎ সেদিন
চকিত বিস্ময়ে দেখি
অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্নিশের ধারে
অশ্বখ গাছের চারা।

অমনি পৃথিবী
আমার চোখের আর মনের পর্দায়
আসন্ন দিনের ছবি মেলে দিল একটি পলকে।

ছোট ছোট চারাগাছ-
রসহীন খাদ্যহীন কার্নিশের ধারে
বলিষ্ঠ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে দূরন্ত উচ্ছ্বাসে।
হঠাৎ চকিতে,
এ শিশুর মধ্যে আমি দেখি এক বৃদ্ধ মহীরুহ
শিকড়ে শিকড়ে আনে অবাধ্য ফাটল



উদ্ধৃত প্রাচীন সেই বনিয়াদী প্রাসাদের দেহে ।

ছোট ছোট চারাগাছ-

নিঃশব্দে হাওয়ায় দোলে, কান পেতে শোনে:
প্রত্যেক ইটের নীচে ঢাকা বহু গোপন কাহিনী
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের ।

তাই তো অবাক আমি, দেখি যত অশ্বখচারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ;
প্রাসাদ-বিদীর্ণ-করা বন্য আসে শিকড়ে শিকড়ে ।

মনে হয়, এই সব অশ্বখ-শিশুর
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের
ধারায় ধারায় জন্ম,
ওরা তাই বিদ্রোহের দূত ।।



সুকান্ত ভট্টাচার্য

রানার



রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে, খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে রানার!
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটো রানার –
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।
রানার! রানার!
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে;
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বীর দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে স'রে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ- বুঝি হয় লাল ও-পূর্বকোণ।
অবাক রাতের তারারা, আকাশে মিটমিট ক'রে চায়!
কেমন ক'রে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায়!
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে –
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে;
হাতে লণ্ঠন করে ঠনঠন, জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ, রানার! এখনো রাতের কালো।
এমনি ক'রেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'।
ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।
অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনদ্র রাত জাগে।
রানার! রানার!
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,



পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে –
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে।
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি, –
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি –
রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা ব'য়ে?
কি হবে ক্ষুধার ক্লাস্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে?
রানার!রানার! ভোর তো হয়েছে – আকাশ হয়েছে লাল
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ
ভীর্ণতা পিছনে ফেলে –
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি –
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো আরো বেগে
দুর্দম, হে রানার।।



সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

উটপাখি



জন্ম : ৩০ অক্টোবর ১৯০১

মৃত্যু : ২৫ জুন ১৯৬০

ওয়েবলিংক

সুধীন দত্তের কবিতা

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছো তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকোবে? ধু-ধু করে মরণভূমি ;
ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে ।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই ;
তুমি বিনা তার সমুহ সর্বনাশ ।
কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা ।
প্রাকপুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা ।।

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া ।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূণ্যে চলবে না আগাগোড়া ।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও ;
মরণদীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনো বিপদপ্রাজ্ঞ নও ।
নব সংসার পাতি গে আবার, চলো
যে-কোনো নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে ।
মিলবে সেখানে অনন্ত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে ।।

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলবো না লোহার চিড়িয়াখানা ;
ডেকে আনবো না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা ।

ভূমিতে ছড়ালে অকারি পালকগুলি
শ্রমশোভন বীজন বানাবো তাতে ;
উধাও তাহার উড্ডীন পদধূলি
পুঞ্জ পুঞ্জ খুঁজবো না অমারাতে ।
তোমার নিবিদে বাজাবো না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে ;
সে-পাড়াছুড়ানো বুলবুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় সে উনতিরিশে ।।

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশিদার
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার ।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি ।
অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি ।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে ।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যাশাপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি :
তুমি নিয়ে চল আমাকে লোকান্তরে,
তোমাকে বন্ধু আমি লোকায়তে বাঁধি ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শাস্ত্রী



শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে
প্রাঙ্গনে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়
স্বর্ণ সুযোগ লুকোচুরি-খেলা করে
গগণে গগণে পলাতক আলো-ছায়া ।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি;
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরন্ধ আগমনী ।
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে;
বিরহ বিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে ।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা ।।

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে –
মনে হয় যেন শত জনমের আগে –
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে ।
সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে ।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চুড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;

একটি পণের অতি প্রগল্ভতা
মর্ত্যে আনিল প্রবতারণার ধ'রে;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথে ছেড়ে দিল অকাতরে ।।
সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে:
অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে;
মদমুকুলিত তারই দেহ সৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে ।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি;
স্বাতি মনিময় তারই প্রত্যভিষেকে ।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম;
সে-রোমরাজি কোমলতা ঘাঁসে ঘাঁসে;
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম;
কিন্তু সে আজ আর করে ভালোবাসে ।
স্মৃতি-পিপিলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রক্তে মৃত মাধুরীর কতা;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না ।



সুবোধ সরকার কী বললেন, বিশ্বায়ন?

আমি আমেরিকায় গিয়ে শুনে এলাম
লোকে ওখানেও বলছে :
দিনকাল যা পড়েছে
তুমি তোমার খাবারের কাছে ঠিক সময়ে
পৌঁছতে না পারলে
অন্য একজন পৌঁছে যাবে।

আরে, এ তো আমাদের দেশে
গরিব লোকেরা করত।
এখন বছরে তিনবার ধান হয় বলে
একজন ভিখিরি, একজন পাগলের খাবার
কেড়ে নেওয়ার আগে দুবার ভাবে।

তবে গতকাল শুনলাম
মাল্টিন্যাশনালে চাকরি করতেন অংশুমান রায়
কী ভাল, তার অফিস তাকে সপরিবারে
মরিশাস পাঠাল বেড়াতে।
দশদিন বাদে ফিরে এসে দেখল
তার চেয়ারে বসে আছে তার থেকে একটু ফর্সা
তার থেকে একটু লম্বা
তার চেয়ে একটু ঘন চুল অন্য এক
অংশুমান রায়।

জন্ম : ২৮ অক্টোবর ১৯৫৮

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
সুবোধ সরকারের ওয়েবসাইট
মিলনসাগর
কবিতায়নে সুবোধ



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কেউ কথা রাখেনি

কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে নি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমী তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিলো
শুক্রা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে
তারপর কতো চন্দ্রভূক অমাবস্যা চলে গেলো,
কিন্তু সেই বোষ্টুমী আর এলোনা
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলী বলেছিলো, বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে!
নাদের আলী, আমি আর কতো বড় হবো? আমার মাথা এ ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে?

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারি নি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কণ পরা ফর্সা রমণীরা
কত রকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায় নি!
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন, আমরাও...
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না!

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিলো,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এ-রকম আতরের গন্ধ হবে!
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠেয়ে প্রাণ নিয়েছি
দূরন্ত ষাড়ের চোখে বেঁধেছি লালকাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখে নি বরুণা, এখন তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে-কোনো নারী।

কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না!



জন্ম : ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
সুনীলের কবিতা
কৃত্তিবাস
লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস প্রজেক্ট
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ডট কম
ফেসবুক ফ্যান পেইজ
ইঠিকানায় সুনীলের কবিতা
ইউটিউবে আর্কেডিয়া
ইউটিউবে কেউ কথা রাখেনি



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পাহাড় চূড়ায়

অনেকদিন থেকেই আমার একটা পাহাড় কেনার শখ। কিন্তু পাহাড় কে বিক্রি করে তা জানি না। যদি তার দেখা পেতাম, দামের জন্য আটকাতো না। আমার নিজস্ব একটা নদী আছে, সেটা দিয়ে দিতাম পাহাড়টার বদলে। কে না জানে পাহাড়ের চেয়ে নদীর দামই বেশি। পাহাড় স্থানু, নদী বহমান। তবু আমি নদীর বদলে পাহাড়ই কিনতাম। কারণ আমি ঠকতে চাই।

নদীটাও অবশ্য আমি কিনেছিলাম একটা দ্বীপের বদলে। ছেলেবেলায় আমার বেশ ছোটোখাটো ছিমছাম একটা দ্বীপ ছিল। সেখানে অসংখ্য প্রজাপতি। শৈশবে দ্বীপটি ছিল বড় প্রিয়।

আমার যৌবনে দ্বীপটি আমার কাছে মাপে ছোট লাগলো। প্রবহমান ছিপছিপে তস্বী নদীটি বেশ পছন্দ হল আমার। বন্ধুরা বললো, ঐটুকু একটা দ্বীপের বিনিময়ে এতবড় একটা নদী পেয়েছিস? খুব তো জিতেছিস মাইরি। তখন জয়ের আনন্দে আমি বিহ্বল হতাম। তখন সত্যিই আমি ভালবাসতাম নদীটিকে।

নদী আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিত। যেমন, বলো তো, আজ সন্কেবেলা বৃষ্টি হবে কিনা?

সে বলতো, আজ এখানে দক্ষিণ গরম হাওয়া। শুধু একটা ছোট দ্বীপে বৃষ্টি, সে কী প্রবল বৃষ্টি, যেন একটা উৎসব।

আমি সেই দ্বীপে আর যেতে পারি না। সে জানতো। সবাই জানে।

শৈশবে আর ফেরা যায় না।

এখন আমি একটা পাহাড় কিনতে চাই। সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে থাকবে গহন অরণ্য, আমি সেই অরণ্য পার হয়ে যাবো, তারপর শুধু রক্ষ্ম কঠিন পাহাড়। একেবারে চূড়ায়, মাথার খুব কাছে আকাশম নিচে বিপুল পৃথিবী, চরাচরে তীব্র নির্জনতা। আমার কণ্ঠস্বর সেখানে কেউ শুনতে পাবে না। আমি ঈশ্বর মানি না, তিনি আমার মাথার কাছে ঝুঁকে দাঁড়াবেন না। আমি শুধু দশ দিককে উদ্দেশ্য করে বলবো, প্রত্যেক মানুষই অহঙ্কারী, এখানে আমি একা – এখানে আমার কোনো অহঙ্কার নেই। এখানে জয়ী হবার বদলে ক্ষমা চাইতে ভালো লাগে। হে দশ দিক, আমি কোনো দোষ করিনি। আমাকে ক্ষমা করো।



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নারী



নাস্তিকেরা তোমায় মানে না, নারী
দীর্ঘ-ঈ-কারের মতো তুমি চুল মেলে
বিপ্লবের শত্রু হয়ে আছো!

এমন কি অদৃশ্য তুমি বহু চোখে
কত লোক নামই শোনেনি
যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে
জল-রং-আলো...

তারা চেনে প্রেমিকা বা সহোদরা
জননী বা জায়া
দুধের দোকানে মেয়ে, কিংবা যারা
নাচে গায়

রান্না ঘরে ঘামে
শিশু কোলে চৌরাস্তায় বাড়ায় কঙ্কাল হাত
ফ্রক কিংবা শাড়ি পরে দুঃখে ইস্কুলে যায়
মিস্তিরির পাশে থেকে সিমেন্টে মেশায় কান্না
কৌটো হাতে পরমার্থ চাঁদা তোলে
কৃষকের পান্তাভাত পৌঁছে দেয় সূর্য ক্রুদ্ধ

হলে

শিয়রের কাছে রেখে উপন্যাস
দুপুরে ঘুমোয়
এরা সব ঠিকঠাক আছে
এদের সবাই চেনে শয়নে, শরীরে
দুঃখ বা সুখের দিনে
অচির সঙ্গিনী!
কিন্তু নারী? সে কোথায়?
চল্লিশ বছর ধরে অবক্ষয়ী কবি-দল
যাকে নিয়ে এমন মেতেছে?

সে কোথায়? সে কোথায়?
দীর্ঘ-ঈ-কারের মতো চুল মেলে
সে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে?
এই ভিড়ে কেমন গোপন থাকো তুমি
যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে
জল-রং আলো...

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যদি নির্বাসন দাও

যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো!
বিষগ্ন আলোয় এই বাংলাদেশ
নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ
প্রান্তরে দিগন্ত নিনির্মেষ -
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

ধানক্ষেতে চাপ চাপ রক্ত
এইখানে ঝরেছিল মানুষের ঘাম
এখনো স্নানের আগে কেউ কেউ করে থাকে নদীকে প্রণাম
এখনো নদীর বুকে
মোচার খোলায় ঘোরে

লুঠেরা, ফেরারী!
শহরে বন্দরে এত অগ্নি বৃষ্টি
বৃষ্টিতে চিক্কণ তবু এক একটি অপরূপ ভোর
বাজারে কুরতা, গ্রামে রণহিংসা
বাতাবি লেবুর গাছে জোনাকির ঝিকমিক খেলা
বিশাল প্রাসাদে বসে কাপুরুষতার মেলা
বুলেট ও বিস্ফোরণ
শঠ তপস্কের এত ছদ্মবেশ
রাত্রির শিশিরে কাঁপে ঘাস ফুল-
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

কুয়াশার মধ্যে এক শিশু যায় ভোরের ইস্কুলে
নিখর দিঘির পাড়ে বসে আছে বক



আমি কি ভুলেছি সব

স্মৃতি, তুমি এত প্রতারণক?

আমি কি দেখিনি কোনো মন্ত্র বিকেলে

শিমুল তুলোর ওড়াউড়ি?

মোষের ঘাড়ের মত পরিশ্রমী মানুষের পাশে

শিউলি ফুলের মত বালিকার হাসি

নিইনি কি খেজুর রসের ঘ্রাণ

শুনিনি কি দুপুরে চিলের

তীক্ষ্ণ স্বর?

বিষণ্ন আলোয় এই বাংলাদেশ

এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি

যদি নির্বাসন দাও আমি ওঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো

আমি বিষপান করে মরে যাবো।



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কোথায় গেল, কোথায়

যারা বারান্দা ঘরে আগুন দিতে গিয়েছিল, তাদের তিনজন
এখন দেয়ালে ঝুলছে, আলাদা মুখ, একই রকম চাহনি
বাকি এগারোজন হারিয়ে গেল, কোথায় গেল, কোথায়?

আর কিছুদিন পর এই শতাব্দী নিঃশব্দে বিদায় নেবে
অনড় গম্ভীর মহাকুর্মের পিঠে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে দিয়ে লেখা
হবে হিসেব
যারা সিংহের মুখে লাগাম পরাতে গিয়েছিল, তাদের দু'জন
শেষ পর্যন্ত পেয়েছে সিংহাসন, গালিচায় রেখেছে পায়ের ছাপ
বাকি সাতজন হারিয়ে গেল, কোথায় গেল, কোথায়?

আসবে নতুন মানুষ, গড়ে উঠবে নতুন সুখী সমাজ
বড় সমবেদনায় তারা একদিন পেছন ফিরে তাকিয়ে বন্দী
হয়ে পড়বে এক দুরন্ত ধাঁধায়
জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির দিকে সমান তালে নিঃশঙ্ক পা ফেলে
গিয়েছিল যে পাঁচজন
তাদের একজনেরও কোনো নাম বা মুখচ্ছবি নেই, তাহলে
সত্যি কি কেউ যায়নি?



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সত্যবদ্ধ অভিমান

এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি?
শেষ বিকেলের সেই ঝুল বারান্দায়
তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
নীরার সুষমা
চোখে ও ভুরুতে মেশা হাসি, নাকি অভ্রবিন্দু?
তখন সে যুবতীকে খুকি বলে ডাকতে ইচ্ছে হয় –
আমি ডান হাত তুলি, পুরুষ পাঞ্জার দিকে
মনে মনে বলি,
যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো –
ছুঁয়ে দিই নীরার চিবুক
এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি?

এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি –
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায়?
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে ভীষণ জরুরী
কথাটাই বলা হয়নি
লঘু মরালীর মতো নারীটিকে নিয়ে যাবে বিদেশী বাতাস
আকস্মিক ভূমিকম্পে ভেঙ্গে যাবে সবগুলো সিঁড়ি
থমকে দাঁড়িয়ে আমি নীরার চোখের দিকে....
ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ
সত্যবদ্ধ অভিমান – চোখ জ্বালা করে ওঠে,
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোন মিথ্যে কি মানায়?



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যা চেয়েছি, যা পাবো না

যা চেয়েছি, যা পাবো না
-কী চাও আমার কাছে?
-কিছু তো চাইনি আমি।
-চাওনি তা ঠিক। তবু কেন
এমন ঝড়ের মতো ডাক দাও?
-জানি না। ওদিকে দ্যাখো
রোদ্দুরে রূপোর মতো জল
তোমার চোখের মতো
দূরবর্তী নৌকো
চতুর্দিকে তোমাকেই দেখা
-সত্যি করে বলো, কবি, কী চাও আমার
কাছে?
-মনে হয় তুমি দেবী...
-আমি দেবী নই।
-তুমি তো জানো না তুমি কে!
-কে আমি!
-তুমি সরস্বতী, শব্দটির মূল অর্থে
যদিও মানবী, তাই কাছাকাছি পাওয়া
মাঝে মাঝে নারী নামে ডাকি
-হাসি পায় শুনে। যখন যা মনে আসে
তাই বলো, ঠিক নয়?
-অনেকটা ঠিক। যখন যা মনে আসে-
কেন মনে আসে?
-কী চাও, বলো তো সত্যি? কথা ঘুরিয়ে না
-আশীর্বাদ!
-আশীর্বাদ? আমার, না সত্যি যিনি দেবী
-তুমিই তো সেই! টেবিলের ঐ পাশে
ফিকে লাল শাড়ি
আঙ্গুলে ছোঁয়ানো থুতনি,
উঠে এসো

আশীর্বাদ দাও, মাথার ওপরে রাখো হাত
আশীর্বাদে আশীর্বাদে আমাকে পাগল করে
তোলো
খিমচে ধরো চুল, আমার কপাল
নোখ দিয়ে চিরে দাও
-যথেষ্ট পাগল আছো! আরও হতে চাও বুঝি?
-তোমাকে দেখলেই শুধু এরকম, নয়তো
কেমন
শান্তশিষ্ট
-না দেখাই ভালো তবে! তাই নয়?
-ভালো মন্দ জেনে শুনে যদি এ-জীবন
কাটাতুম
তবে সে-জীবন ছিল শালিকের, দোয়েলের
বনবিড়ালের কিংবা মহাত্মা গান্ধীর
ইরি ধানে, ধানের পোকার যে-জীবন
-যে জীবন মানুষের?
-আমি কি মানুষ নাকি? ছিলাম মানুষ বটে
তোমাকে দেখার আগে
-তুমি সোজাসুজি তাকাও চোখের দিকে
অনেকক্ষণ চেয়ে থাকো
পলক পড়ে না
কী দেখো অমন করে?
-তোমার ভিতরে তুমি, শাড়ি-সজ্জা খুলে
ফেললে
তুমি
তারা আড়ালে যে তুমি
-সে কি সত্যি আমি? না তোমার নিজের কল্পনা
-শোন খুকী
-এই মাত্র দেবী বললে-
-একই কথা! কল্পনা আধার যিনি, তিনি দেবী-



তুই সেই নীরা
 তোর কাছে আশীর্বাদ চাই
 -সে আর এমন কি শক্ত? এফুনি তা দিতে পারি
 -তোমার অনেক আছে, কথা মাত্র দাও
 -কী আছে আমার? জানি না তো
 -তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই
 -সিঁড়ির ওপরে সেই দেখা
 তখন তো বলোনি কিছু?
 আমার নিঃসঙ্গ দিন, আমার অবেলা
 আমারই নিজস্ব – শৈশবের হাওয়া শুধু জানে

-দেবে কি দুঃখের অংশভাগ? আমি
 ধনী হবো
 -আমার তো দুঃখ নেই – দুঃখের চেয়েও
 কোনো সুমহান আবিষ্কৃত
 আমাকে রয়েছে ঘিরে
 তার কোনো ভাগ হয় না
 আমার কী আছে আর, কী দেবো তোমাকে?
 -তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই!
 তুমি দেবী, ইচ্ছে হয় হাঁটু গেড়ে বসি
 মাথায় তোমার করতল, আশীর্বাদ...
 তবু সেখানেও শেষ নেই
 কবি নয়, মুহূর্তে পুরুষ হয়ে উঠি
 অস্থির দু'হাত
 দশ আঙুলে আঁকড়ে ধরতে চায়
 সিংহিনীর মতো ঐ যে তোমার কোমর
 অবোধ শিশুর মতো মুখ ঘষে তোমার শরীরে
 যেন কোনো গুপ্ত সংবাদের জন্য ছটফটানি
 -পুরুষ দূরত্বে যাও, কবি কাছে এসো
 তোমায় কী দিতে পারি?
 -কিছু নয়!
 -অভিমান?
 -নাম দাও অভিমান!
 -এটা কিন্তু বেশ! যদি
 অসুখের নাম দিই নির্বাসন
 না-দেখার নাম দিই অনন্তিত্ব

দূরত্বের নাম দিই অভিমান?
 -কতটুকু দূরত্ব? কী, মনে পড়ে?
 -কী করে ভাবলে যে ভুলবো?
 -তুমি এই যে বসে আছো, আঙুলে ছোঁয়ানো থুতনি
 কপালে পড়েছে চূর্ণ চুল
 পাড়ের নক্সায় ঢাকা পা
 ওষ্ঠাধ্রে আসন্ন হাসি-
 এই দৃশ্যে অমরত্ব
 তুমি তো জানো না, নীরা,
 আমার মৃত্যুর পরও এই ছবি থেকে যাবে।
 -সময় কি থেমে থাকবে? কী চাও আমার কাছে?
 -মৃত্যু?
 -ছিঃ, বলতে নেই
 -তবে স্নেহ? আমি বড় স্নেহের কাঙাল
 -পাওনি কি?
 -বুঝতে পারি না ঠিক। বয়স্ক পুরুষ যদি স্নেহ চায়
 শরীরও সে চায়
 তার গালে গাল চেপে দিতে পারো মধুর উত্তাপ?
 -ফের পাগলামি?
 -দেখা দাও।
 -আমিও তোমায় দেখতে চাই।
 -না!
 -কেন?
 -বোলো না। কক্ষনো বোলো না আর এ কথা
 আমি ভয় পাবো।
 এ শুধুই এক দিকের
 আমি কে? সামান্য, অতি নগণ্য, কেউ না
 তুবি এত স্পর্ধা করে তোমার রূপের কাছে –
 -তুমি কবি?
 -তা কি মনে থাকে? বারবার ভুলে যাই
 অবুঝ পুরুষ হয়ে কৃপাপ্রার্থী
 -কী চাও আমার কাছে?
 -কিছু নয়। আমার দু'চোখে যদি ধুলো পড়ে
 আঁচলের ভাপ দিয়ে মুছে দেবে?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ইচ্ছে

কাচের চুড়ি ভাঙার মতন মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে
দুটো চারটে নিয়ম কানুন ভেঙে ফেলি
পায়ের তলে আছরে ফেলি মাথার মুকুট
যাদের পায়ের তলায় আছি তাদের মাথায় চড়ে বসি
কাচের চুড়ি ভাঙার মতই ইচ্ছে করে অবহেলায়
ধর্ম তলায় দিন দুপুরে পথের মধ্যে হিসি করে ।
ইচ্ছে করে দুপুর রোদে ব্ল্যাক আউটের হুকুম দেবার
ইচ্ছে করে বিবৃতি দেই ভাঁওতা মেরে জনসেবার
ইচ্ছে করে ভাঁওতাবাজ নেতার মুখে চুনকালি দেই
ইচ্ছে করে অফিস যাবার নাম করে যাই বেলুড় মঠে
ইচ্ছে করে ধর্মাধর্ম নিলাম করে মুর্গিহাটায়
বেলুন কিনি বেলুন ফাটাই, কাচের চুড়ি দেখলে ভাঙি
ইচ্ছে করে লগুভগু করি এবার পৃথিবীটাকে
মণ্ডুমেণ্টের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলি
আমার কিছু ভাল্লাগেনা ।।



সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লোকটা জানলই না



জন্ম : ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯

মৃত্যু : ৮ জুলাই ২০০৩

ওয়েবলিংক

উইকিপিডিয়া পেইজ
ওয়াপিডিয়া পেইজ
লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস প্রজেক্ট
ক্যালকাটা ওয়েব
রেফারেন্স ডট কম

বাঁ দিকের বুক পকেটটা সামলাতে সামলাতে
হায়! হায়! লোকটার ইহকাল পরকাল গেল!
অথচ আর একটু নীচে হাত দিলেই
সে পেতো আলাদ্বীনের আশ্চর্য প্রদীপ,
তার হৃদয়!
লোকটা জানলোই না!

তার কড়ি গাছে কড়ি হল।
লক্ষ্মী এল রণ-পায়ে
দেয়াল দিল পহাড়া
ছোটলোক হাওয়া যেন ঢুকতে না পারে!

তারপর একদিন
গোথাসে গিলতে গিলতে
দু'আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে –
কখন খসে পড়েছে তার জীবন –
লোকটা জানলই না!



সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মে-দিনের কবিতা

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সৈঁকে চামড়া।

চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে।

প্রণয়ের যৌতুক দাও প্রতিবন্ধে
মারণের পণ নখদন্তে;
বন্ধন ঘুচে যাবে জাগবার ছন্দে,
উজ্জ্বল দিন দিক-অন্তে।

শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা।
মৃত্যুর ভয়ে ভীর্ণ বসে থাকা, আর না –
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।



সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফুল ফুটুক না ফুটুক

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোঁটা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঝুলি পরিয়ে
তারপর খুলে –
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে –
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত –
তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল –

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।
অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে।



সুরজিত ঘোষ

আজ ভালো থাকো

তোমার সঙ্গে এত বেশি মেলামেশা
উচিত হয়নি, আর আমি আসব না।
শুধু, আজ তুমি সারা দিন ভালো থেকে
যেন তোমার ঐ সন্ধ্যাবেলার জ্বর
আজকে না আসে, তোমার গলার স্বর
একেবারে নিভে যাওয়ার ক'দিন আগে
আমাকে ডাকলে, যে ভাবেই হোক সেদিন আসব আবার।
আজ ভালো থাকো, তোমার জন্মদিনে
এর বেশি আর কি আছে আমার চাওয়ার।



সিলভিয়া প্লাথ

অক্টোবরের পপি

এমনকি সৌরমেঘ এ সকাল পারবে না সামলাতে এ ধরনের স্কাটকে।
সে নারীও না যে অ্যান্থলেসে আছে
যার লাল হৃদয় ফোটে জামার ভেতর বিপ্লবকরভাবে

একটি উপহার, ভালবাসার উপহার
সম্পূর্ণ অযাচিত
একটি আকাশ দ্বারা

তার রোদটুপির নিচে যে চোখ তা থেকে
নিঃপ্রভভাবে শিখা প্রজ্জ্বলিত করছে কার্বন মনোঅক্সাইড

ও ঈশ্বর, আমি কি
এই বয়স্কমুখগুলো হা করে কাঁদবে
তুমিরাচ্ছাদিত বনে, নীল ঝুমকো ফুলের ভোরে।

অনুবাদ : আয়শা বার্না

ওয়েবলিংক

জন্ম : ২৭ অক্টোবর ১৯৩২
মৃত্যু : ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩

উইকিপিডিয়া পেইজ
সিলভিয়া প্লাথ ডট ডিই
পয়েন্টস ডট অর্গ
সিলভিয়া প্লাথের কবিতা



সিলভিয়া প্লাথ

দি অ্যাপলিকেন্ট



কবি পরিচিতি

সিলভিয়া প্লাথ ইংরেজ কবি। স্কুল ও কলেজ শেষে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে ভর্তি হন ক্যামব্রিজের নিউহ্যাম কলেজে। সেখানে কবি টেড হিউজের সাথে পরিচয়, প্রণয়। টেড হিউজকে বিয়ে করেন ১৯৫৬ সালে। কিছুদিন পর সিলভিয়া ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তার দুই ছেলেমেয়ে নিকোলাস ও ফ্রিডার জন্ম হয়। আজন্ম বিষণ্ণতায় ভুগতে থাকে সিলভিয়া ১৯৬৩ সালে আত্মহত্যা করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫ সালে তার এরিয়েল কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করলে সাহিত্যমহলে সাড়া পড়ে যায়। এই কাব্যগ্রন্থটি পাঁচবার রিপ্রিন্ট হয়।

প্রথম কথা, তুমি কি আমাদের লোক?
তুমি কি পরো
কাঁচের চোখ, নকল দাঁত বা ক্লাচ,
একটি গেলিস বা একটি হুক,
রাবারের বুক কিংবা রাবারের কোমরবন্ধনী,

সূচিছিদ্রগুলো, দেখাতে যে কিছু একটা হারিয়েছে? না, না? তাহলে
তোমাকে আমরা কোনো কিছু কিভাবে দেব?
কান্না থামাও।
খোল তোমার হাত।
শূন্য? শূন্য। এই যে একখানা হাত

ভরিয়ে দেবার জন্য এবং ইচ্ছুক
চায়ের কাপ আনতে, মাথার ব্যাথা সারিয়ে দিতে
এবং তুমি যা বলবে তাই করতে,
তুমি কি তাকে বিয়ে করবে?
এটা নিশ্চিত যে

এর আঙুল অবশেষে ঘুম পাড়িয়ে দেবে তোমার চোখগুলোকে
আর মোচন করবে দুঃখ।
আমরা লবণ থেকে গড়ে তুলি নতুন ভাঙার।
আমি লক্ষ করছি তুমি পুরোদস্তুর নগ্ন।
কেমন এ পোশাক –

কালো এবং জৌলুসহীন কিন্তু ফিটফাট।
একে কি তুমি বিয়ে করবে?

এটি ওয়াটারপ্রুফ, শ্যাটারপ্রুফ, প্রুফ
আগুন থেকে এবং ছাদ ভেদ করে পড়া বোমা থেকে।
বিশ্বাস করো, তারা তোমাকে কবর দেবে এর মধ্যে।



আসি তোমার মাথার প্রশ্নে, দুঃখের বিষয়, এটি শূন্য ।
আমার কাছে ওইটার জন্য টিকেট আছে ।
আসো মিষ্টি মেয়ে, নিভৃত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসো ।

আচ্ছা, তুমি এ নিয়ে কী ভাবছ?
একটি সাদা কাগজের মতো নগ্নতা থেকে পারো গুরু করতে

কিন্তু বছর পঁচিশের মধ্যে সে-মেয়ে হবে রূপা,
পঞ্চাশে, সে হবে সোনা ।
এক জ্যাস্ত পুতুল, যদিকেই তাকাবে তুমি ।
এটি সেলাই করতে পারে, রাঁধতে পারে,
এটি কথা বলে, কথা বলে, কথা বলে ।

এটি কাজ করে এতে কোনোই ভুল নাই ।

তোমার একটি গর্ত আছে, এটি বেদনা উপশম করার উপমা ।
তোমার একটি চোখ আছে, যা এক উপমা ।

শোনো ছেলে, এই হলো তোমার শেষ আশ্রয় ।
তুমি কি তাকে বিয়ে করবে, করবে বিয়ে, করবে বিয়ে ।

অনুবাদ : আয়শা বার্না



সিলভিয়া প্লাথ

লেডি ল্যাজারাস

আমি আবার করেছি এ কাজটা
প্রতি বছরে দশবার
আমি এটা করি

যেনবা চলন্ত বিশ্বায়, আমার চামড়া
নাজি ল্যাম্পশেডের মতো উজ্জ্বল
আমার ডান পা

একটি পেপারওয়াইট
আমার মুখ অভিব্যক্তিহীন, মিহি ইহুদি লিনেনের মতো
আমি কি আতংক ধরাই?

সেই নাক, সেই চোখের মণি, পুরো দাঁতের পাঁটি?
টক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
একদিনেই হয়ে যাবে শেষ।

দ্রুত খুব দ্রুত কবরের
যে অন্ধকার আমাকে খেয়ে ফেলেছিল
আবার তা হবে পুনরুজ্জীবিত

এবং আমি হয়ে উঠব হাস্যজ্জ্বল নারী
যে মাত্র ত্রিশ, আর বেড়ালের মতো
চেপ্টা করেছি নয়বার মরতে

এবার তৃতীয়বারের মতো
কি বিরজিকর!
একেকটা দশককে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া

কত লক্ষ ফিলামেন্ট।
বাদামের খোসা চেপ্টানো ভিড়
ধাক্কা দিয়ে আসে দেখতে



ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ
আমার হাত ও পা থেকে কাপড় যাবে খসে
নগ্ন নৃত্যের মতো—

হতে পারে এই হাত, এই পা হলো
আমার একমাত্র পরিচয়,

সে যাই হোক, আমি সেই একই নারী
এটি প্রথম ঘটেছিল যখন আমি দশ বছরের
এটি ছিল দুর্ঘটনামাত্র।

দ্বিতীয়বার যখন করি
চাইছিলাম সেটাই হোক আমার শেষ এবং
আর যাতে ফিরে না আসি।

ঝিনুকের পাথুরে খোলসের ভেতর নিজে
করলাম আবদ্ধ।
তারা ডেকে গেল, ডেকেই গেল
আঠাল মুক্তোর মতো তারা
পোকাগুলোকে তুলে নিয়েছিল আমার শরীর থেকে।

মৃত্যু একটা শিল্প, অন্য সবকিছুর মতোই
আমি খুব ভালভাবে এটা করি।

আমি তা করি কারণ এটি নরকের অনুভব আনে
আমি এটা করি কারণ তা সত্যিই অনুভব করি
আমার মনে হয় আপনি বলে উঠবেন
'আমার একটি কল আছে।'

এটি খুব সহজ হয় ছোট একটি প্রকোষ্ঠে করা
এটি খুব সহজ এবং যেমন আছে তেমন থাকা
এবং নাটকীয়ভাবে
প্রখর দিনের আলোয় ফিরে আসা
ঠিক একই জায়গা, একই মুখ, একই নিষ্ঠুরতা
মজা পাওয়া চিৎকার

যাদু
যা আমাকে করে দেয় মূমূর্ষু



এর একটা দাম আছে

আমার ক্ষতগুলোর একটা মূল্য হয় দিতে
আমার হৃদপিণ্ডের ধ্বনি শোনার একটা দাম আছে।

এবং একটি শব্দ অথবা একটি ছোঁয়া
কিংবা রক্তচক্ষুটা এরও আছে একটি বিরাট মূল্য।

আমার একটুকরো চুল কিংবা আমার কাপড়।
তাই-ই ডক্টর, তাই-ই আমার শত্রু।

আমি তোমার রচিত
আমি তোমার অমূল্যরতন
খাঁটি সোনায় তৈরি শিশুটি
চিৎকার যায় গলে,
ঘুরতে থাকি, পুড়ে যাই
ভেবো না তোমার বিবেচনাকে দেখছি খাটো করে।

ছাই, ছাই
তুমি তাকে খোঁচাও, নাড়া দাও
সেখানে মাংস, হাড়ছাড়া কিছুই নেই।

একটুকরো সাবান,
একটি বিয়ের আঙুটি,
একটি সোনার দাঁত।

জনাব ঈশ্বর, জনাব লুসিফার
সাবধান
সাবধান।

ছাইয়ের ভেতর থেকে
আমি আমার লালচুলসহ উঠে আসি
আর পুরুষ খাই বাতাসের মতো।

অনুবাদ : আয়শা বার্না



সিলভিয়া প্লাথ

সকালের গান

স্নেহ তোমাকে মোটা সোনায় মোড়ানো ঘড়িতে পরিণত করেছে
তোমার ছোট্ট পায়ে পরিচারিকার ছোট্ট চাপড় আর তোমার আদুরে কান্না
জায়গা করে নিল সবকিছুর ভেতর।



আমাদের স্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে
তোমার আগমনকে বিবর্ধিত করছে। নতুন মূর্তি
আকর্ষক যাদুঘরে, তোমার আদুল গা
আমাদের স্বস্তিকে ছায়া দেয় আশ্বস্ত করে
আমরা গোল হয়ে নিরেট দেয়ালের মতো দাঁড়াই।

আমি তোমার মায়ের চেয়ে বেশি কিছু নই
মেঘের গায়ে রৌদ্রছট্টা প্রতিফলিত হয়ে
ধীরে মিলায় বাতাসের হাতে,

সারারাত তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস
গোলাপের পাতায় পোকাকার মতো কাঁপছে,
আমি জেগে উঠি শোনার জন্য..
দূর সমুদ্র ভেসে আসে কানে।

একটি কান্না এবং আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম
বিছানা থেকে, আমার ফুলেল নাইটগাউনটি দুগ্ধসিক্ত,
বেড়ালের মতো তোমার মুখ খুলে গেল, বর্গাকার জানালাটি

মিটমিটে তারাগুলোকে গ্রাস করছে, সরিয়ে দিচ্ছে
এবং এখন তুমি চেষ্টা করছ
মুঠোভরতি নোটস দিতে,
পরিষ্কার স্বরবর্ণগুলি জেগে উঠছে বেলুনের মতো।

অনুবাদ : আয়শা বার্না



সৈয়দ শামসুল হক

এখন মধ্যরাত

এখন মধ্যরাত ।

তখন দুপুরে রাজপথে ছিলো মানুষের পদপাত ।

মিছিলে মিছিলে টলমল ছিলো সারাদিন রাজধানী ।

এখন কেবল জননকূল ছিল বুড়িগঙ্গার পানি

শান্ত নীরব

নিদ্রিত সব ।

ওই একজন জানালায় রাখে তার বিন্দ্র হাত

ছিলো একদিন তার

উজ্জ্বল দিন, ছিলো যৌবন ছিলো বহু চাইবার ।

সারা রাত চষে ফিরেছে শহর খুঁজেছে সে ভালোবাসা ।

পেতেছে সে হাত – জীবনের কাছে ছিলো তারও প্রত্যাশা পাওয়া না পাওয়ার

প্রশ্নে হাওয়ার

বাস্পরস্ক কণ্ঠে এখন সারারাত হাহাকার ।

পথে ওড়ে ধুলো, ছাই ওড়ে শুধু – পথে যে আগুন ছিলো

একদা সে জ্বলে ছিলো ।

হৃদয়ে এখন সৌধের ভাঙা টুকরো আছাড় খায় ।

আলো নিভে যায়, নিভে যায় আলো একে একে জানালায় ।

থেমে যায় গান

তারপরও প্রাণ

বাঁশিটির মতো বেজে চলে – যেন সবই আছে সবই ছিলো ।



জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫

ওয়েবলিংক

সৈয়দ হকের ওয়েবসাইট

উইকিপিডিয়া পেইজ

ভিজিউইকি পেইজ

প্রবন্ধ : সৈয়দ হকের গল্প



হেলাল হাফিজ

ফেরীঅলা

কষ্ট নেবে কষ্ট
হরেক রকম কষ্ট আছে
কষ্ট নেবে কষ্ট!

লাল কষ্ট নীল কষ্ট কাঁচা হলুদ রঙের কষ্ট
পাথর চাপা সবুজ ঘাসের সাদা কষ্ট,
আলোর মাঝে কালোর কষ্ট
'মালটি-কালার' কষ্ট আছে
কষ্ট নেবে কষ্ট।

ঘরের কষ্ট পরের কষ্ট পাখি এবং পাতার কষ্ট
দাড়ির কষ্ট
চোখের বুকের নখের কষ্ট,
একটি মানুষ খুব নীরবে নষ্ট হবার কষ্ট আছে
কষ্ট নেবে কষ্ট।

প্রেমের কষ্ট ঘৃণার কষ্ট নদী এবং নারীর কষ্ট
অনাদর ও অবহেলার তুমুল কষ্ট,
ভুল রমণী ভালোবাসার
ভুল নেতাদের জনসভার
হাইড্রোজেনে দুইটি জোকার নষ্ট হবার কষ্ট আছে
কষ্ট নেবে কষ্ট।

দিনের কষ্ট রাতের কষ্ট
পথের এবং পায়ের কষ্ট
অসাধারণ করুণ চারু কষ্ট ফেরীঅলার কষ্ট
কষ্ট নেবে কষ্ট।

আর কে দেবে আমি ছাড়া
আসল শোভন কষ্ট,
কার পুড়েছে জন্ম থেকে কপাল এমন
আমার মত ক'জনের আর
সব হয়েছে নষ্ট,
আর কে দেবে আমার মতো হুঁপুট কষ্ট।

ওয়েবলিংক

হেলাল হাফিজের কবিতা
ফেসবুক ফ্যান পেইজ
ই-কবিতা
গুগল গ্রুপ ফ্যান পেইজ



হেলাল হাফিজ

নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
মিছিলের সব হাত
কণ্ঠ

পা এক নয়।
সেখানে সংসারী থাকে, সংসার বিরাগী থাকে,
কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার।
কেউ আসে জ্বালিয়ে বা জ্বালাতে সংসার
শাস্ত্র শান্তির যারা তারাও যুদ্ধে আসে
অবশ্য আসতে হয় মাঝে মধ্যে
অস্তিত্বের প্রগাঢ় আহ্বানে,
কেউ আবার যুদ্ধবাজ হয়ে যায় মোহরের প্রিয় প্রলোভনে
কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুঁতী হতে হয়।

যদি কেউ ভালোবেসে খুঁতী হতে চান
তাই হয়ে যান
উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়।

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।



হেলাল হাফিজ

প্রস্থান



এখন তুমি কোথায় আছো কেমন আছো, পত্র দিয়ে ।
এক বিকেলে মেলায় কেনা খামখেয়ালী তাল পাখাটা
খুব নিশীথে তোমার হাতে কেমন আছে, পত্র দিয়ে ।
ক্যালেন্ডারের কোন্ পাতাটা আমার মতো খুব ব্যথিত
ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকে তোমার দিকে, পত্র দিয়ে ।
কোন্ কথাটা অষ্টপ্রহর কেবল বাজে মনের কানে
কোন্ স্মৃতিটা উস্কানি দেয় ভাসতে বলে প্রেমের বানে
পত্র দিয়ে, পত্র দিয়ে ।

আর না হলে যত্ন করে ভুলেই যেয়ো, আপত্তি নেই?
গিয়ে থাকলে আমার গেছে, কার কী তাতে?
আমি না হয় ভালোবেসেই ভুল করেছি ভুল করেছি,
নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে
পাঁচ দুপুরের নির্জনতা খুন করেছি, কী আসে যায়?

এক জীবনে কতোটা আর নষ্ট হবে,
এক মানবী কতোটা আর কষ্ট দেবে!



হুমায়ূন আজাদ

সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে

আমি জানি সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে ।
নষ্টদের দানবমুঠোতে ধরা পড়বে মানবিক
সব সংঘ-পরিষদ; চ'লে যাবে, অত্যন্ত উল্লাসে
চ'লে যাবে এই সমাজ-সভ্যতা-সমস্ত দলিল-
নষ্টদের অধিকারে ধুয়েমুছে, যে-রকম রাষ্ট্র
আর রাষ্ট্রযন্ত্র দিকে দিকে চ'লে গেছে নষ্টদের
অধিকারে । চ'লে যাবে শহর বন্দর ধানখেত
কালো মেঘ লাল শাড়ি শাদা চাঁদ পাখির পালক
মন্দির মসজিদ গির্জা সিনেগগ পবিত্র প্যাগোডা ।
অস্ত্র আর গণতন্ত্র চ'লে গেছে, জনতাও যাবে;
চাষার সমস্ত স্বপ্ন আন্তাকুড়ে ছুঁড়ে একদিন
সাধের সমাজতন্ত্রও নষ্টদের অধিকারে যাবে ।

আমি জানি সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে ।
কড়কড়ে রৌদ্র আর গোলগাল পূর্ণিমার চাঁদ
নদীরে পাগল করা ভাটিয়ালি খড়ের গম্বুজ
শ্রাবণের সব বৃষ্টি নষ্টদের অধিকারে যাবে ।
রবীন্দ্রনাথের সব জ্যোৎস্না আর রবিশংকরের
সমস্ত আলাপ হৃদয়স্পন্দন গাথা ঠোঁটের আঙুর
ঘাইহরিণীর মাংসের চিৎকার মাঠের রাখাল
কাশবন একদিন নষ্টদের অধিকারে যাবে ।
চলে যাবে সেই সব উপকথাঃ সৌন্দর্য-প্রতিভা-
মেধা; -এমনকি উন্মাদ ও নির্বোধদের প্রিয় অমরতা
নির্বাধ আর উন্মাদদের ভয়ানক কষ্ট দিয়ে
অত্যন্ত উল্লাসভরে নষ্টদের অধিকারে যাবে ।

আমি জানি সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে ।
সবচে সুন্দর মেয়ে দুই হাতে টেনে সারারাত
চুষবে নষ্টের লিঙ্গ; লম্পটের অশ্লীল উরুতে
গাঁথা থাকবে অপার্থিব সৌন্দর্যের দেবী । চ'লে যাবে,
কিশোরীরা চ'লে যাবে, আমাদের তীব্র প্রেমিকারা
ওষ্ঠ আর আলিঙ্গন ঘৃণা ক'রে চ'লে যাবে, নষ্টদের
উপপত্তী হবে । এই সব গ্রন্থ শ্লোক মুদ্রাযন্ত্র
শিশির বেহালা ধান রাজনীতি দোয়েলের স্বর
গদ্য পদ্য আমার সমস্ত ছাত্রী মার্ক্স-লেনিন,
আর বাঙলার বনের মত আমার শ্যামল কন্যা-
রাষ্ট্রগ্রন্থ সভ্যতার অবশিষ্ট সামান্য আলোক-
আমি জানি তারা সব নষ্টদের অধিকারে যাবে ।

জন্ম : ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭

মৃত্যু : ১১ আগস্ট ২০০৪

ওয়েবলিংক

সাক্ষাৎকার

মুক্তধারায় হুমায়ূন আজাদ

ইন্সপির্স লাইব্রেরি

উইকি



হুমায়ূন আজাদ

আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে



আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে
আমার খাদ্যে ছিলো অন্যদের আগ্নেলের দাগ,
আমার পানীয়তে ছিলো অন্যদের জীবাণু,
আমার নিশ্বাসে ছিলো অন্যদের ব্যাপক দূষণ।
আমি জন্মেছিলাম, আমি বেড়ে উঠেছিলাম,
আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।
আমি দাঁড়াতে শিখেছিলাম অন্যদের মতো,
আমি হাঁটতে শিখেছিলাম অন্যদের মতো,
আমি পোশাক পরতে শিখেছিলাম অন্যদের মতো ক'রে,
আমি চুল আঁচড়াতে শিখেছিলাম অন্যদের মতো ক'রে,
আমি কথা বলতে শিখেছিলাম অন্যদের মতো।
তারা আমাকে তাদের মত দাঁড়াতে শিখিয়েছিলো,
তারা আমাকে তাদের মতো হাঁটার আদেশ দিয়েছিলো,
তারা আমাকে তাদের মতো পোশাক পরার নির্দেশ দিয়েছিলো,
তারা আমাকে বাধ্য করেছিলো তাদের মত চুল আঁচড়াতে,
তারা আমার মুখে গুঁজে দিয়েছিলো তাদের দূষিত কথামালা।
তারা আমাকে বাধ্য করেছিলো তাদের মত বাঁচতে।
আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।
আমি আমার নিজস্ব ভঙ্গিতে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম,
আমি হাঁটতে চেয়েছিলাম নিজস্ব ভঙ্গিতে,
আমি পোশাক পরতে চেয়েছিলাম একান্ত আপন রীতিতে,
আমি চুল আঁচড়াতে চেয়েছিলাম নিজের রীতিতে,
আমি উচ্চারণ করতে চেয়েছিলাম আমার আস্তর মৌলিক মাতৃভাষা।
আমি নিতে চেয়েছিলাম নিজের নিশ্বাস।
আমি আহার করতে চেয়েছিলাম আমার একান্ত মৌলিক খাদ্য,
আমি পান করতে চেয়েছিলাম আমার মৌলিক পানীয়।
আমি ভুল সময়ে জন্মেছিলাম। আমার সময় তখনো আসে নি।
আমি ভুল বৃক্ষে ফুটেছিলাম। আমার বৃক্ষ কখনো অঙ্কুরিত হয় নি।
আমি ভুল নদীতে স্রোত হয়ে বয়েছিলাম। আমার নদী তখনো উৎপন্ন হয় নি।
আমি ভুল মেঘে ভেসে বেরিয়েছিলাম। আমার মেঘ তখনো আকাশে জমে নি।



আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে ।
আমি গান গাইতে চেয়েছিলাম আমার আপন সুরে,
ওরা আমার কণ্ঠে পুরে দিতে চেয়েছিলো ওদের শ্যাওলাপড়া সুর ।
আমি আমার মতো স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলাম,
ওরা আমাকে বাধ্য করেছিলো ওদের মত ময়লাধরা স্বপ্ন দেখতে ।
আমি আমার মতো দাঁড়াতে চেয়েছিলাম,
ওরা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলো ওদের মত মাথা নিচু ক'রে দাঁড়াতে ।
আমি আমার মতো কথা বলতে চেয়েছিলাম,
ওরা আমার মুখে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিলো ওদের শব্দ ও বাক্যের আবর্জনা ।
আমি খুব ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিলাম,
ওরা আমাকে ওদের মতোই দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিলো বাইরে ।
ওরা মুখে এক টুকরো বাসি মাংস পাওয়াকে ভাবতো সাফল্য,
ওরা নতজানু হওয়াকে ভাবতো গৌরব,
ওরা পিঠের কুঁজকে মনে করতো পদক,
ওরা গলার শেকলকে মনে করতো অমূল্য অলঙ্কার ।
আমি মাংসের টুকরো থেকে দূরে ছিলাম । এটা ওদের সহ্য হয় নি ।
আমি নতজানু হওয়ার বদলে বুকে ছুরিকাকে সাদর করেছিলাম ।
এটা ওদের সহ্য হয় নি ।
আমি গলার বদলে হাতেপায়ে শেকল পরেছিলাম । এটা ওদের সহ্য হয় নি ।
আমি অন্যদের সময়ে বেঁচে ছিলাম । আমার সময় তখনো আসে নি ।
ওদের পুকুরে প্রথাগত মাছের কোন অভাব ছিলো না,
ওদের জমিতে অভাব ছিলো না প্রথাগত শস্য ও শজির,
ওদের উদ্যানে ছিলো প্রথাগত পুষ্পের উল্লাস ।
আমি ওদের সময়ে আমার মতো দিঘি খুঁড়েছিলাম ব'লে
আমার দিঘিতে পানি ওঠে নি ।
আমি ওদের সময়ে আমার মত চাষ করেছিলাম ব'লে
আমার জমিতে শস্য জন্মে নি ।
আমি ওদের সময়ে আমার মতো বাগান করতে চেয়েছিলাম ব'লে
আমার ভবিষ্যতের বিশাল বাগানে একটিও ফুল ফোটে নি ।
তখনো আমার দিঘির জন্যে পানি উৎসারণের সময় আসে নি ।
তখনো আমার জমির জন্যে নতুন ফসলের সময় আসে নি ।
তখনো আমার বাগানের জন্যে অভিনব ফুলের মরশুম আসে নি ।
আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে ।
আমার সব কিছু পর্যবসিত হয়েছে ভবিষ্যতের মতো ব্যর্থতায়,



ওরা ভ'রে উঠেছে বর্তমানের মতো সাফল্যে ।
ওরা যে-ফুল তুলতে চেয়েছে, তা তুলে এনেছে নখ দিয়ে ছিঁড়েফেড়ে ।
আমি শুধু স্বপ্নে দেখেছি আশ্চর্য ফুল ।
ওরা যে-তরুণীকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছে, তাকে জড়িয়ে ধরেছে দস্যুর মতো ।
আমার তরুণীকে আমি জড়িয়ে ধরেছি শুধু স্বপ্নে ।
ওরা যে নারীকে কামনা করেছে, তাকে ওরা বধ করেছে বাহুতে চেপে ।
আমার নারীকে আমি পেয়েছি শুধু স্বপ্নে ।
চুষনে ওরা ব্যবহার করেছে নেকড়ের মতো দাঁত ।
আমি শুধু স্বপ্নে বাড়িয়েছি ওষ্ঠ ।
আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে ।
আমার চোখ যা দেখতে চেয়েছিলো, তা দেখতে পায় নি ।
তখনো আমার সময় আসে নি ।
আমার পা যে-পথে চলতে চেয়েছিলো, সে-পথে চলতে পারে নি ।
তখনো আমার সময় আসে নি ।
আমার ত্বক যার ছোঁয়া পেতে চেয়েছিলো, তার ছোঁয়া পায় নি ।
তখনো আমার সময় আসে নি ।
আমি যে-পৃথিবীকে চেয়েছিলাম, তাকে আমি পাই নি ।
তখনো আমার সময় আসে নি । তখনো আমার সময় আসে নি ।
আমি বেঁচেছিলাম
অন্যদের সময়ে ।



হুমায়ূন আজাদ

বাঙলা ভাষা

শেকলে বাঁধা শ্যামল রূপসী, তুমি-আমি, দুর্বিণীত দাসদাসী-
একই শেকলে বাঁধা প'ড়ে আছি শতাব্দীর পর শতাব্দী।
আমাদের ঘিরে শাঁইশাঁই চাবুকের শব্দ, স্তরে স্তরে শেকলের ঝংকার।
তুমি আর আমি সে-গোত্রের যারা চিরদিন উৎপীড়নের মধ্যে গান গায়-
হাহাকার রূপান্তরিত হয় সঙ্গীতে-শোভায়।

লকলকে চাবুকের আক্রোশ আর অজগরের মতো অন্ধ শেকলের
মুখোমুখি আমরা তুলে ধরি আমাদের উদ্ধত দর্পিত সৌন্দর্য:
আদিম ঝরনার মতো অজস্র ধারায় ফিনকি দেয়া টকটকে লাল রক্ত,
চাবুকের থাবায় সূর্যের টুকরোর মতো ছেঁড়া মাংস
আর আকাশের দিকে হাতুড়ির মতো উদ্যত মুষ্টি।

শাঁইশাঁই চাবুকে আমার মিশ্র মাংসপেশি পাথরের চেয়ে শক্ত হয়ে ওঠে
তুমি হয়ে ওঠো তপ্ত কাঞ্চনের চেয়েও সুন্দর।
সভ্যতার সমস্ত শিল্পকলার চেয়ে রহস্যময় তোমার দু-চোখ
যেখানে তাকাও সেখানেই ফুটে ওঠে কুমুদকল্লার
হরিণের দ্রুত ধাবমান গতির চেয়ে সুন্দর ওই ভ্রুয়ুগল
তোমার পিঠে চাবুকের দাগ চুনির জড়োয়ার চেয়েও দামি আর রঙিন
তোমার দুই স্তন ঘিরে ঘাতকের কামড়ের দাগ মুক্তোমালার চেয়েও ঝলমলো
তোমার 'অ, আ' —চিৎকার সমস্ত আর্থশ্রমিকের চেয়েও পবিত্র অজর

তোমার দীর্ঘশ্বাসের নাম চন্ডীদাস
শতাব্দী কাঁপানো উল্লাসের নাম মধুসূদন
তোমার থরোথরো প্রেমের নাম রবীন্দ্রনাথ
বিজন অশ্রুবিন্দুর নাম জীবনানন্দ
তোমার বিদ্রোহের নাম নজরুল ইসলাম

শাঁইশাঁই চাবুকের আক্রোশে যখন তুমি আর আমি
আকাশের দিকে ছুঁড়ি আমাদের উদ্ধত সুন্দর বাহু, রক্তাক্ত আঙুল,
তখন সৃষ্টি হয় নাচের নতুন মুদ্রা;
ফিনকি দেয়া লাল রক্ত সমস্ত শরীরে মেখে যখন আমরা গড়িয়ে পড়ি
ধূসর মাটিতে এবং আবার দাঁড়াই পৃথিবীর সমস্ত চাবুকের মুখোমুখি,
তখন জন্ম নেয় অভাবিত সৌন্দর্যমন্ডিত বিশুদ্ধ নাচ;
এবং যখন শেকলের পর শেকল চুরমার ক'রে বানবান ক'রে বেজে উঠে
আমরা দুজন, তখন প্রথম জন্মে গভীর-ব্যাপক-শিল্পসম্মত ঐকতান-
আমাদের আদিগন্ত আতর্নাদ বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের
একমাত্র গান।



হুমায়ূন আজাদ

শ্রেমিকার মৃত্যুতে



খুব ভালো চমৎকার লাগছে লিলিআন,
মুহূর্মুহু বিস্ফোরণে হবো না চৌচির।
তরঙ্গে তরঙ্গে ভ্রষ্ট অন্ধ জলযান
এখন চলবে জলে খুব ধীরস্থির।
অন্য কেউ ঢেলে নিচ্ছে ঠোঁট থেকে লাল
মাংস খুঁড়ে তুলে নিচ্ছে হীরেসোনামনি;
এই ভয়ে কাঁপবে না আকাশপাতাল,
থামবে অরণ্যে অগ্নি আকাশে অশনি।

আজ থেকে খুব ধীরে পুড়ে যাবে চাঁদ,
খুব সুস্থ হয়ে উঠবে জীবনযাপন।
অন্ধ জলে ঘ্রাণে পাবো অবিকল স্বাদ,
চিনবো শত্রুর মুখে, কারা-বা আপন।
বুঝবো নিদ্রার জন্যে রাত্রি চিরদিন,
যারা থাকে ঘুমহীন তারা গায় গান।
রঙিন রক্তের লক্ষ্য ঠান্ডা কফিন;
খুব ভালো চমৎকার লাগছে লিলিআন।

ব্যাধিকে রূপান্তরিত করছি মৃত্যুয়

একপাশে শূন্যতার খোলা, অন্যপাশে মৃত্যুর ঢাকনা,
প'ড়ে আছে কালো জলে নিরর্থক ঝিনুক।
অন্ধ ঝিনুকের মধ্যে অনিচ্ছায় ঢুকে গেছি রক্তমাংসময়
আপাদমস্তক বন্দী ব্যাধিবীজ। তাৎপর্য নেই কোন দিকে-
না জলে না দেয়ালে-তাৎপর্যহীন অভ্যন্তরে ক্রমশ উঠছি বেড়ে
শোণিতপ্লাবিত ব্যাধি। কখনো হুলা ক'রে হাঙ্গরকুমীরসহ
ঠেলে আসে হলদে পুঁজ, ছুটে আসে মরা রক্তের তুফান।
আকস্মিক অগ্নি ঢেলে ধেয়ে আসে কালো বজ্রপাত।
যেহেতু কিছুই নেই করণীয় ব্যাধিরূপে বেড়ে ওঠা ছাড়া,
নিজেকে-ব্যাধিকে-যাদুরসায়নে রূপান্তরিত করছি শিল্পে-
একরঙি নিটোল মৃত্যুয়!



হুমায়ূন আজাদ

আমার কুঁড়েঘরে

আমার কুঁড়েঘরে নেমেছে শীতকাল
তুষার জ'মে আছে ঘরের মেঝে জুড়ে বরফ প'ড়ে আছে
গভীর ঘন হয়ে পাশের নদী ভ'রে
বরফ ঠেলে আর তুষার ভেঙে আর দু-ঠোটে রোদ নিয়ে
আমার কুঁড়েঘরে এ-ঘন শীতে কেউ আসুক

আমার গ্রহ জুড়ে বিশাল মরুভূমি
সবুজ পাতা নেই সোনালি লতা নেই শিশির কণা নেই
ঘাসের শিখা নেই জলের রেখা নেই
আমার মরুভূর গোপন কোনো কোণে একটু নীল হয়ে
বাতাসে কেঁপে কেঁপে একটি শীষ আজ উঠুক

আমার গাছে গাছে আজ একটি কুঁড়ি নেই
একটি পাতা নেই শুকনো ডালে ডালে বায়ুর ঘষা লেগে
আগুন জ্ব'লে ওঠে তীব্র লেলিহান
বাকল ছিঁড়েফেড়ে দুপুর ভেঙেচুরে আকাশ লাল ক'রে
আমার গাছে আজ একটা ছোট ফুল ফুটুক

আমার এ-আকাশ ছড়িয়ে আছে ওই
পাতটিনের মতো ধাতুর চোখ জ্বলে প্রখর জ্বালাময়
সে-তাপে গ'লে পড়ে আমার দশদিক
জল ও বায়ুহীন আমার আকাশের অদেখা দূর কোণে
বৃষ্টিসকাতর একটু মেঘ আজ জমুক

আমার কুঁড়েঘরে নেমেছে শীতকাল
তুষার জ'মে আছে ঘরের মেঝে জুড়ে বরফ প'ড়ে আছে
গভীর ঘন হয়ে পাশের নদী ভ'রে
বরফ ঠেলে আর তুষার ভেঙে আজ দু-ঠোটে রোদ নিয়ে
আমার কুঁড়েঘরে এ-ঘন শীতে কেউ আসুক



হুমায়ূন আজাদ

গরিবদের সৌন্দর্য



গরিবেরা সাধারণত সুন্দর হয় না।
গরিবদের কথা মনে হ'লে সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ে না কখনো।
গরিবদের ঘরবাড়ি খুবই নোংরা, অনেকের আবার ঘরবাড়িই নেই।
গরিবদের কাপড়চোপড় খুবই নোংরা, অনেকের আবার কাপড়চোপড়ই নেই।
গরিবেরা যখন হাঁটে তখন তাদের খুব কিছুত দেখায়।
যখন গরিবেরা মাটি কাটে ইট ভাঙে খড় ঘাঁটে গাড়ি ঠেলে পিচ ঢালে তখন তাদের সারা দেহে ঘাম জবজব করে, তখন তাদের খুব নোংরা আর কুৎসিত দেখায়।
গরিবদের খাওয়ার ভঙ্গি শিম্পাঞ্জির ভঙ্গির চেয়েও খারাপ।
অশ্লীল হাঁ ক'রে পাঁচ আগুলে মুঠো ভ'রে সব কিছু গিলে ফেলে তারা।
থুতু ফেলার সময় গরিবেরা এমনভাবে মুখ বিকৃত করে
যেনো মুখে সাতদিন ধ'রে পচছিলো একটা নোংরা ইঁদুর।
গরিবদের ঘুমোনের ভঙ্গি খুবই বিশ্রী।
গরিবেরা হাসতে গিয়ে হাসিটাকেই মাটি ক'রে ফেলে।
গান গাওয়ার সময়ও গরিবদের একটুও সুন্দর দেখায় না।
গরিবেরা চুমো খেতেই জানে না, এমনকি শিশুদের চুমো খাওয়ার সময়ও
থকথকে থুতুতে তারা নোংরা করে দেয় ঠোঁট নাক গাল।
গরিবদের আলিঙ্গন খুবই বেচপ।
গরিবদের সঙ্গমও অত্যন্ত নোংরা, মনে হয় নোংরা মেঝের ওপর
সাংঘাতিকভাবে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে দু'টি উলঙ্গ অশ্লীল জন্তু।
গরিবদের চুলে উকুন আর জট ছাড়া কোনো সৌন্দর্য নেই।
গরিবদের বগলের তলে থকথকে ময়লা আর বিচ্ছিরি লোম সব জড়াজড়ি করে।
গরিবদের চোখের চাউনিতে কোনো সৌন্দর্য নেই,
চোখ ঢ্যাবঢ্যাব ক'রে তারা চারদিকে তাকায়।
মেয়েদের স্তন খুব বিখ্যাত, কিন্তু গরিব মেয়েদের স্তন শুকিয়ে শুকিয়ে
বুকের দু-পাশে দুটি ফোড়ার মতো দেখায়।
অর্থাৎ জীবনযাপনের কোনো মুহূর্তেই গরিবদের সুন্দর দেখায় না।

শুধু যখন তারা রুখে ওঠে কেবল তখনই তাদের সুন্দর দেখায়।



স্পাইক মিলিগান

বাড়িতে স্বাগতম

আমার অপরাধ না জেনেই
তারা আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালো।

আমি জীবনদন্ড পেলাম...
তাকে ছাড়া।

অদ্ভুত বিচার
জজ নেই
জুরি নেই।

আমার দর্শনার্থী কারা হবে ভেবে আমি
বিস্মিত।

এছাড়া

‘খুব সুরম্য বাড়ি’

যতক্ষণ না তুমি প্রাণশক্তিতে ক্লান্ত

পাগলপারা হয়ে

পালিয়েছিলে আর দৌড়াতে

দৌড়াতে দৌড়াতে গাড়িচাপা পড়েছিলে,

ততক্ষণ তোমাকে দেয়া হয়েছিলো আদর

আর মাংসের চাপ

বাকি ছিলো কেবল দুরন্ত দৌড়ঝাঁপ।

আজ তোমার জন্য তারা কাঁদবে

কালও, তবে অন্য কুকুরের জন্য।

আয়না, আয়না

এক তরুণী বসন্ত ছোঁয়া মেয়ে

আঁচড়াচ্ছিলো তার উচ্ছল চুল

“তুমি খুবই কুৎসিত” আয়না বলেছিলো

যদিও,

তার ঠোঁটে মাখা ছিলো

গোপন-নরম অনুরাগের একচিলতে হাসি

কেননা ওই সকালেই অন্ধ ছেলেটি তাকে

বলেছিলো

‘তুমি সুন্দর’!

আমার বোন লরা

আমার থেকে বড় অনেক আমার বোন লরা
তার জন্য সহজ খুবই আমায় তুলে ধরা
আমি তাকে তুলতে পারিনা চেষ্টা যতই করি
হৃদয়ে তার এমন কিছু মন্ত যেটা ভারি।

অনুবাদ : মূর্তালা রামাত

একটি তুচ্ছ কবিতা

বলে হ্যামলেট ওফেলিয়াকে
আঁকবো আমি তোমার ছবি
কোন পেন্সিল হলে ভালো হয় বলো?
২বি অর নট ২বি?

কুকুর প্রেমিকেরা

তারা তোমাকে কিনেছিলো
আর রেখেছিলো
সুরম্য বাড়িতে
এসি
টিভি
ডিপ ফ্রিজসহ
একটি সুরম্য বাড়ি-
কেবল তোমাকে নেয়নি কেউ
দুরন্ত দৌড়ঝাঁপে



জন্ম : ১৬ এপ্রিল ১৯১৮
মৃত্যু : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২

কবি পরিচিতি

আইরিশ পিতার ঔরসজাত
স্পাইক মিলিগান ভারতের
আহমেদনগরে জন্মগ্রহণ করেন।
তিনি আয়ারল্যান্ডের অন্যতম
রম্যলেখক, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি ও
নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃত। সিলি
ভার্সেস ফর কিডস্ (১৯৫৯), এ
ডাস্টবিন অব মিলিগান (১৯৬১),
দ্যা লিটল পট বয়লার (১৯৬৫),
পুকুন (১৯৬৩), দ্যা বেড সাইড
মিলিগান, গুডবাই সোলজার
(১৯৮৬), হিডেন ওয়ার্ডস:
কালেক্টড পোয়েমস প্রভৃতি তার
নামকরা গ্রন্থ।





কৃতজ্ঞতা



somewhere in... blog

মতামত

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির



প্রথম আলো
মুগা



মুক্তাঙ্গন

মুক্তমনা



উইকিপিডিয়া



মুর্শেদের ইউনিকোড
লেখনী ও পরিবর্তক

অন্যমনস্ক শরণ	ফাহিমদুল হক
অরণ্য	ফারিহান মাহমুদ
অগ্ন্য	ফারহানা আহমেদ
আবদুর রাজ্জাক শিপন	ফিরে দেখা ১৯৭১
আন্দালীব	বিবর্তনবাদী
আয়শা বার্না	বিলাল
অ্যামাটার	বিগব্যাং
আহমেদ ফারুক	মুকুল
একরামুল হক শামীম	মনজুরুল হক
এস্কিমো	মরিয়ম
কাঁকন	মেঘ মনির
কানা বাবা	মাহবুব মোর্শেদ
কালপুরুষ	মুক্তি মণ্ডল
কৌশিক	মূর্তালা রামাত
কোলাহল	রাজষী
চাঞ্চু	রংবেল শাহ
জটিল	রেটিং
ঝুমী	শওকত হোসেন মাসুম
তরু	শফিউল আলম ইমন
দূরের পাখি	সুলতানা শিরিন সাজি
নুশেরা	সোনালী ডানার শঙ্খচিল
নুপুর	সুরভিছায়া
নির্জন রহমান	সুনীল সমুদ্র
নির্বর নৈঃশব্দ	সবাক
পথিক	সামন্তল আলম
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব	স্বপ্নকর
প্রতিদিন	হরিণ
প্রণব আচার্য	হাসান বিপুল
ফকির ইলিয়াস	হুদাই



রূগের কয়েকটি প্রকাশনা



ফিরে দেখা ৭১

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নির্বাচিত লেখার সংকলন

ধরন : ই-সংকলন

প্রকাশকাল : ১২ জুলাই ২০০৮



অপরবাস্তব ৩

সামহোয়ারইন... রূগ গল্প সংকলন ২০০৮

ধরন : বই

প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০০৮